

কিশলয়

সাহিত্য
প্রথম ভাগ



3001
23.7.75

3315

কিশলয়

কিশলয়

সাহিত্য

প্রথম ভাগ

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

S.C.E.R.T., West
Library
Calcutta
25/3, B. C. R

তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তা
রাইটার্স বিল্ডিংস্
কলিকাতা

West Bengal
7- 85
315

Neither this book nor any keys, hints, comments, notes, meanings, annotations, connotations, answers and solutions should be printed, published or sold without the prior approval of the Director of Public Instruction, West Bengal.

নবপর্যায় সংস্করণ নভেম্বর : ১৯৬৮
পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৬৯
পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৭২
পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুআরি ১৯৭৪
পুনর্মুদ্রণ : জানুআরি ১৯৭৫

মুদ্রক
ইম্পিরিয়াল ক্যালেণ্ডার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
৪৬, মেটকাফ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ভূমিকা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রকের পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কয়েক বৎসর আগে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে সেই সব পাঠ্যপুস্তক পরিবেশনও ছিল পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

কিশলয় সাহিত্যপাঠের বর্তমান সংস্করণ কিশলয় সংস্কার সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্বের সংস্করণগুলিতে কেবল চলিত রীতিতে লিখিত রচনাই স্থান পেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি; তবে এবার সাধুভাষায় লিখিত রচনা চলিত ভাষায় রূপান্তরিত, সংক্ষেপিত বা পরিবর্তিত না করে কেবল চলিত ভাষায় লিখিত রচনা অথবা তার অংশবিশেষ সংকলন করা হয়েছে।

নবপর্যায় কিশলয় প্রত্যেক পাঠের নীচে অনুশীলনী যুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় অনুশীলনীর অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলি পাঠ্যবস্তুর সম্যক অনুশীলনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই সহায়ক হবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো পঠন পাঠন কেবল এই সব প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ যেন না থাকে।

পুস্তকের শেষে নির্বাচিত একটি শব্দতালিকা দেওয়া হয়েছে।

যাঁরা কিশলয়ের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে রচনা লিখে দিয়েছেন এবং যে-সব মুদ্রিত পুস্তক থেকে অংশবিশেষ গৃহীত হয়েছে সেই সব লেখক ও প্রকাশকগণকে ধন্যবাদ জানাই।

কিশলয় সংস্কার সমিতির সদস্যেরা এবং যাঁরা এই নবপর্যায় সংকলন ও সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলেই শিক্ষা-অধিকারের কৃতজ্ঞতাভাজন।

আকারে, ছবিতে ও ছাপায় নবপর্যায় কিশলয় যাতে মনোরঞ্জক হয় তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। অলংকরণে ও মুদ্রণে যাঁরা সহযোগ করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

রাইটার্স বিল্ডিংস্
জানুআরি ১৯৭৫

শ্রীনিশীথরঞ্জন কর
শিক্ষা-অধিকর্তা

ভূমিকা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রকের পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কয়েক বৎসর আগে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে সেই সব পাঠ্যপুস্তক পরিবেশনও ছিল পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই পরিকল্পনার পরিপূরক হিসাবে ১৯৭০ সনের জানুআরি মাস থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বই বিনামূল্যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া শুরু হয়েছে।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে স্থির হয়েছে যে, ১৯৭৫ সনের জানুআরি মাস থেকে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য সরকার-প্রকাশিত সমস্ত প্রকারের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হবে।

আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের অগণিত ছাত্রছাত্রী এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হবেন ও এই ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

নিশীথরঞ্জন কর
শিক্ষা-অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ

মহাকরণ
জানুআরি ১৯৭৫

সূচীপত্র

১ অনুবাদ

প্রার্থনা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার



ছোটো শিশু মোরা তোমার করুণা
হৃদয়ে মাগিয়া লব ;
জগতের কাজে, জগতের মাঝে
আপনা ভুলিয়া রব।

ছোটো তারা হাসে আকাশের গায়ে
ছোটো ফুল ফোটে গাছে,
ছোটো বটে তবু তোমার জগতে
আমাদেরও কাজ আছে।

দাও তবে প্রভু, হেন শুভ মতি,
প্রাণে দাও নব আশা ;
জগৎ মাঝারে যেন সবাকারে
দিতে পারি ভালোবাসা।

সুখে দুখে শোকে অপরের লাগি
যেন এ জীবন ধরি ;
অশ্রু মুছায়ে বেদনা ঘুচায়ে
জীবন সফল করি।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :
করুণা ; হৃদয়ে ; মাগিয়া ; আপনা ; জগতে ; হেন ; শুভ ; মতি ; বেদনা ; ঘুচায়ে ; জীবন ধরি ; সফল ; নব ; শোকে ; লাগি ; অশ্রু।

২। নীচের শব্দগুলোর বিপরীত অর্থ শেখো :
নব ; সফল ; শুভ।

৩। ছোটো তারা কি করে? ছোটো ফুল কোথায় থাকে?

৪। ছোটো শিশুরা কী প্রার্থনা করছে?

৫। কিভাবে ছোটো শিশু তার জীবন সফল করতে পারে?

৬। কবিতাটি আবৃত্তি করার জন্য মুখস্থ করো।

হাঁস আর কচ্ছপের গল্প

রাজশেখর বসু



এক সরোবরে দুটি হাঁস এবং তাদের বন্ধু একটি কচ্ছপ থাকত। একদিন জেলেরা এসে বললে, "কাল আমরা জাল ফেলে সমস্ত মাছ আর কচ্ছপ ধরে নিয়ে যাব।" সেই কথা শুনে কচ্ছপ ভয় পেয়ে তার দুই বন্ধুকে বললে, "এখন কি করা উচিত?" হাঁসেরা বললে, "আগে ভালো করে খবর নিতে হবে, তার পর কাল সকালবেলা যা হয় করা যাবে।" কচ্ছপ বললে, "অন্য সরোবরে চলো।" হাঁসেরা বললে, "অন্য সরোবরে গেলে তোমার ভালোই হবে, কিন্তু তুমি তো পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না!" কচ্ছপ বললে, "তোমরা দুজনে একটা কাঠির দুদিক ঠোঁট দিয়ে ধরবে, আমি কাঠির মাঝখানটা কামড়ে ধরে থাকব; এই রকমে তোমরা আমাকে নিয়ে, উড়ে যাবে।"

কচ্ছপের কথা শুনে দুই হাঁস বললে, "হাঁ, সেরকম করে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি বটে। কিন্তু তোমাকে আকাশে দেখে নানা লোকে নানা-রকম কথা বলবে। তুমি যদি তার উত্তর দাও তবে কাঠি থেকে খসে পড়ে তখনই মরবে।"





কচ্ছপ বললে, "আমাকে তেমন বোকা পাও নি, যে যাই বলুক আমি চুপ করে থাকব।"

তার পর কচ্ছপকে নিয়ে দুই হাঁস উড়ে চলল। মাঠে গোয়ালারা গোরু চরাচ্ছিল, তারা আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল, এবং বলল, "কচ্ছপটা মাটিতে পড়ে গেলেই আমরা ওকে পুড়িয়ে খাব।" এই কথা শুনে কচ্ছপ অত্যন্ত চটে গেল। সে বলে ফেলল—"তোরা ছাই খাবি!" যেমন বলল অমনি সে ধপ্ করে পড়ে গেল, গোয়ালারা তাকে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলল।



অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :
আশ্চর্য ; অত্যন্ত ; সরোবর।

২। নীচে-দাগ-দেওয়া দুটি কথার অর্থের পার্থক্য শেখো :
(ক) কচ্ছপ ধপ্ করে পড়ে গেল।
(খ) তার বোন নতুন কাপড় পরে ইস্কুলে গেল।

৩। কচ্ছপ অন্য সরোবরে যেতে চেয়েছিল কেন?

৪। অন্য সরোবরে যাবার কী উপায় স্থির করা হয়েছিল?

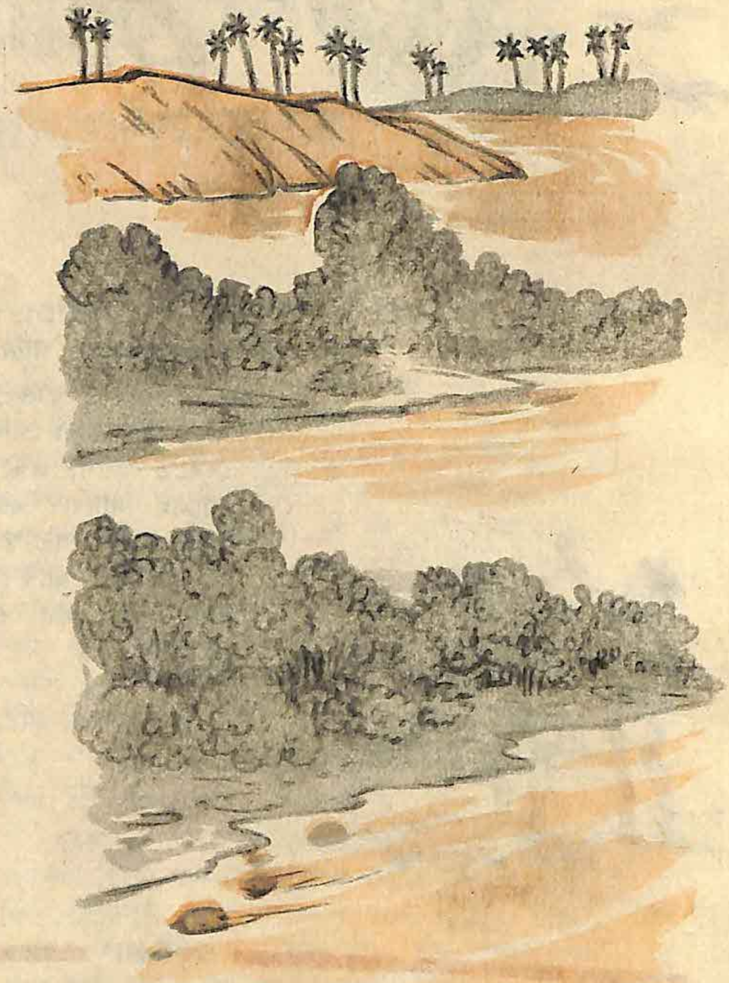
৫। কার দোষে কচ্ছপ মারা পড়েছিল? কচ্ছপ মুখ খুলেছিল কেন?

৬। মুখ না খুললেও অন্য কিভাবে কচ্ছপের বিপদ হতে পারত?

৭। 'হিতোপদেশের গল্প' ও 'ঈশপের গল্প' পড়ো।

ছোটো নদী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

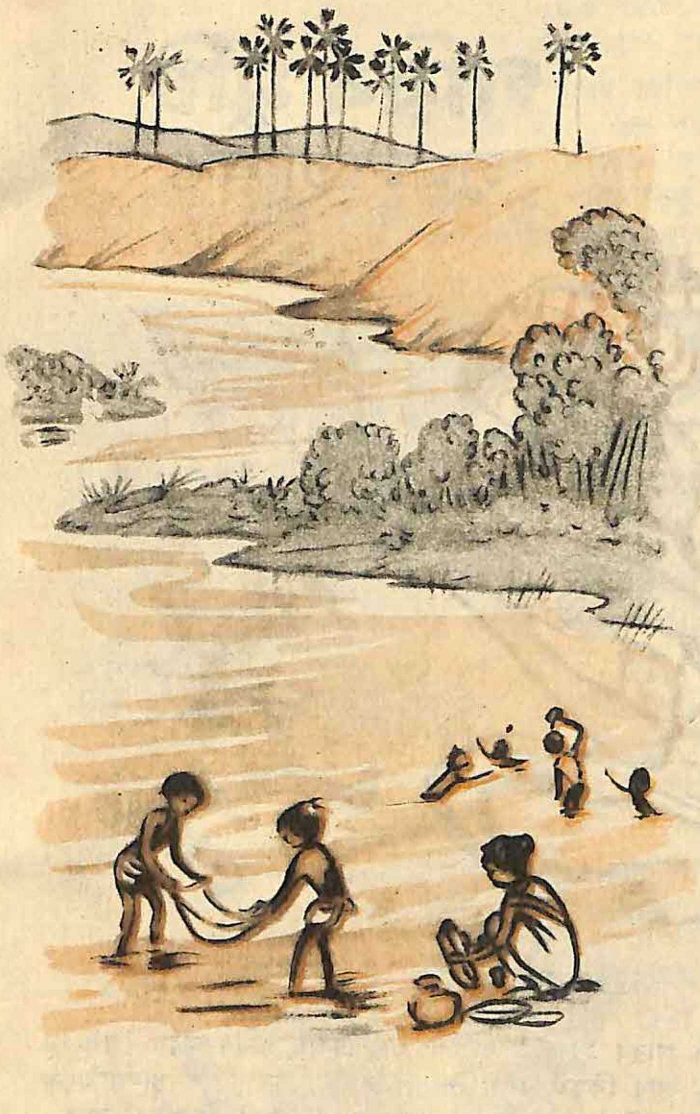


আমাদের ছোটো নদী
চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার
হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু,
পার হয় গাড়ি—
দুই ধার উঁচু তার,
ঢালু তার পাড়ি।

চিক্ চিক্ করে বালি,
কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশ-বন
ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা
শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে
শেয়ালের হাঁক।

আর পারে আম-বন
তাল-বন চলে,
গাঁয়ের বামুন-পাড়া
তারি ছায়া-তলে।
তীরে তীরে ছেলে মেয়ে
নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি
গায়ে তারা ঢালে।





সকালে বিকালে কভু
নাওয়া হলে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা
ছোটো মাছ ধরে।
বালি দিয়ে মাজে থালা,
ঘটিগুলি মাজে—
বধূরা কাপড় কেচে
যায় গৃহকাজে।

আষাঢ়ে বাদল নামে
নদী ভরো-ভরো,
মাতিয়া ছুটিয়া চলে
ধারা খরতর।

মহাবেগে কলকল
কোলাহল ওঠে,
ঘোলা জলে পাকগুলি
ঘুরে ঘুরে ছোটে।

দুই কূলে বনে বনে
পড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে
জেগে ওঠে পাড়া।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :
কভু ; বাদল ; ধারা ; খরতর ; কূলে।

২। এই শব্দগুলির মানে শেখো এবং পৃথক পৃথক বাক্যে ব্যবহার করো :
পাড়া, পারা ; সাড়া, সারা ; পাড়ি, পারি।

৩। বৈশাখ মাসে ছোটো নদীটির অবস্থা কেমন হয়?

৪। আষাঢ় মাসে ছোটো নদীর চেহারা কেমন হয়?

৫। 'বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া'। কেমন উৎসব? পাড়া জেগে ওঠে কি করে?

৬। স্কুলের উৎসবে আবৃত্তি করার জন্য কবিতাটি মুখস্থ করো।

৭। একটি নদীর ছবি আঁকো, তার একধারে কাশবন, ছেলেমেয়েরা মাছ ধরছে, এইসব দেখাও।

গরিব মুচি

সুখলতা রাও



এক মুচি ছিল। সে বেচারি গরিব হতে হতে শেষটায় এমন গরিব হয়ে গেল যে তার শুধু এক টুকরো চামড়া ছাড়া আর কিছুই রইল না। সন্ধ্যার সময়ে সে চামড়াটাকে কেটে রেখে দিয়েছে, পরদিন সকালে উঠে তাই দিয়ে এক জোড়া জুতা সেলাই করবে। সকালে উঠে দেখে. কি আশ্চর্য! সেই চামড়াটুকু দিয়ে কে এমন সুন্দর জুতা তৈরি করে রেখেছে যে অমন জুতা মুচি কখনোই সেলাই করতে পারে না। একটি ফোঁড় ছোটো-বড়ো হয় নি, কোথাও এক চুল কম-বেশি কাটা হয় নি। সেই জুতা বিক্রি করে তার এত পয়সা হল যে, তাই দিয়ে সে আরো চার জোড়া জুতার চামড়া কিনল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মুচি চার জোড়া জুতার চামড়া কেটে রেখেছিল। মনে করল পরদিন তাই দিয়ে জুতা তৈরি করবে। কিন্তু পরদিন উঠে দেখে, চার জোড়া জুতাই কে সেলাই করে রেখেছে, আর চমৎকার সেলাই করেছে।

মুচির তো মজাই হল; রোজ সন্ধ্যাবেলা সে চামড়া কেটে রাখে, আর রোজ রাত্রে কে এসে তার সব জুতা সেলাই করে দেয়। মুচি দেখতে দেখতে বড়োলোক হয়ে গেল। তার দোকানে যেমন জুতা পাওয়া যায়, সে দেশে আর কোনো দোকানে তেমন সুন্দর জুতা পাওয়া যায় না। লোকে ঢের বেশি দাম দিয়েও খুশি হয়ে তার জুতা কেনে।

একদিন মুচি তার স্ত্রীকে বলল, "রোজ রাত্রে এসে কে আমার সব জুতা সেলাই করে রাখে ? চলো তো আজ আমরা লুকিয়ে থেকে দেখি।"

সেদিন রাত্রে মুচি আর তার স্ত্রী ঘরের কোণে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ তারা কিছু দেখতে পেল না। তার পর যখন রাত দুপুর হয়েছে, আর তাদের বড্ড ঘুম পেয়েছে, তখন সুড়ুৎ করে কোথেকে দুটি ভূতের খোকা এসে ঘরে ঢুকেছে। তিন পো হাত উঁচু এতটুকু খোকা দুটি, পরনে কিছু নেই। তাদের চোখদুটি খালি মিট্‌মিট্ করছে, আর তারা হাসছে আর তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে।

মুচি সেদিন অনেকগুলি জুতার চামড়া কেটে রেখে দিয়েছিল। খোকা দুটি হাসতে হাসতে সেই চামড়ার কাছে গিয়ে বসল। তার পর দুজনে মিলে ঠুক্‌ঠাক্ খুট্‌খাট্ এমনি সেলাই করতে লাগল যে কি বলব! মুচি আর তার স্ত্রী এ-সব দেখে এতই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে যে, তারা বুঝতেই পারছে না কেমন করে কি হচ্ছে। দেখতে দেখতে সব জুতা সেলাই করে দিয়ে, খোকা দুটি কোনখান দিয়ে যে পালাল, তাও তারা বুঝতে পারল না।

যা হোক, খোকা দুটির উপর তাদের বড়ো মায়া হয়েছে, তাই মুচির স্ত্রী মুচিকে বলল, "ছোট্ট ছোট্ট খোকারা আমাদের এত কাজ করে দেয়, আমরা কি ওদের জন্য কিছু করতে পারি না ?" মুচি বলল, "হাঁ, তাই তো, আমরা কি কিছু করতে পারি না ? আচ্ছা বলো তো কি করা যায় ?" মুচির স্ত্রী বলল, "আচ্ছা আমি যদি ওদের দুজনের জন্য দুটি পোশাক সেলাই করে দি, আর তুমি ছোট্ট ছোট্ট জুতা বানিয়ে দাও, তবে কেমন হয় ? এই শীতের মধ্যে বেচারিরা রোজ রাত্রে শুধু-গায়ে আসে, ওদের বোধ হয় বড়ো কষ্ট হয়।"



পরদিন মুচির স্ত্রী দুজনের ছোট্ট ছোট্ট দুখানি লাল রঙের পোশাক তৈরি করল, আর মুচি দু জোড়া লাল জুতা বানাল। রোজ সন্ধ্যাবেলা যেখানে জুতার জন্য চামড়া কেটে রাখত, সেদিন সেখানে আর চামড়া না রেখে, পোশাক আর জুতা রেখে দিল। তার পর মুচি আর মুচির স্ত্রী চুপ করে ঘরের কোণে রইল লুকিয়ে।

দুপুর রাত্রে আবার সেই খোকা দুটি এসেছে। এসেই তো তারা এখানে খুঁজছে, ওখানে খুঁজছে, কোথাও জুতার চামড়া দেখতে পাচ্ছে না। কোথায় পাবে? সেদিন তো আর চামড়া রাখা হয় নি। তার বদলে সেই পোশাক ও জুতা রাখা হয়েছে। খোকা দুটি চামড়া খুঁজতে গিয়ে তাই দেখতে পেয়ে খুশি যা হল! সেই কাপড় আর জুতা উলটে পালটে দেখে আর হাসে। তার পর আস্তে আস্তে পোশাক দুটি পরে দেখল ঠিক হয়েছে। জুতায় পা ঢুকিয়ে দেখল ঠিক হয়েছে। তখন দুজনে মিলে খানিকক্ষণ খুব নাচল। তার পর হাসতে হাসতে সেখান থেকে ছুটে পালাল, আর এল না।



অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো
চমৎকার; বেচারি; ফোঁড়।

২। তাদের চোখ দুটি <u>খালি</u> মিটমিট্ করছে।
অনেক দিন থেকে বাড়িটি <u>খালি</u> রয়েছে।
সে <u>খালি</u> গায়ে স্নান করে।
উপরের বাক্যগুলিতে নীচে-দাগ-দেওয়া শব্দগুলোর অর্থের পার্থক্য শেখো।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করো:
সেদিন —— বেলা —— —— জোড়া —— চামড়া কেটে রেখেছিল। —— করল —— তাই ভ্রিয়ে —— তৈরি করবে। কিন্তু পরদিন —— ——, চার —— জুতাই কে —— করে রেখেছে, আর —— —— করেছে!

৪। গরিব মুচির জুতা তৈরি করে রেখে দিত কে?

৫। কেমন করে জানা গেল কে জুতা তৈরি করে দেয়?

৬। গরিব মুচি ধনী হল কেমন করে?

৭। মুচি ও তার স্ত্রী খোকা দুটিকে কি উপহার দিল?

৮। উপহার পেয়ে খোকারা আর এল না কেন?

হাট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি—
বোঝাই-করা কলসি হাঁড়ি।

গাড়ি চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে যে যায় ভাগ্‌নে মদন।

হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে।

জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।





উচ্ছে বেগুন পটল মুলো,
বেতের বোনা ধামা কুলো,

সর্ষে ছোলা ময়দা আটা
শীতের র‍্যাপার নক্‌শা-কাটা।

ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা,
শহর থেকে সস্তা ছাতা।

কলসি-ভরা এখো গুড়ে
মাছি যত বেড়ায় উড়ে।

খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে
আনল যত চাষীর মেয়ে।

অন্ধ কানাই পথের 'পরে
গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।

পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে
জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :
স্নান ; নক্‌শা-কাটা।

২। নীচে-দাগ-দেওয়া কথা দুটির অর্থের পার্থক্য শেখো :
(ক) মাঝি নৌকা বেয়ে যায়।
(খ) লোকটি গাছ বেয়ে উঠছে।

৩। গোরুর গাড়িতে বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি কি দিয়ে তৈরি?

৪। হাটে কি কি জিনিস বেচা-কেনার জন্য আনা হয়েছিল?

৫। হাটটি কোন ঋতুতে বসেছিল বলে তোমার মনে হয়? কেমন করে তা বোঝা যায়?

৬। তোমার দেখা একটি হাটের বিবরণ লেখো।



টুনটুনি আর রাজার কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকুতে দিয়েছিল, সন্ধ্যার সময় তাঁর লোকেরা তার একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল।

টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এনে রেখে দিলে, আর ভাবলে, 'ঈস্! আমি কত বড়োলোক হয়ে গেছি। রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরেও সেই ধন আছে!' তার পর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে, আর বলে—

রাজার ঘরে যে ধন আছে
টুনির ঘরে সে ধন আছে!

রাজা তাঁর সভায় বসে সে কথা শুনতে পেয়ে জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁরে! পাখিটা কি বলছে রে?'

সকলে হাত জোড় করে বললে, 'মহারাজ পাখি বলছে, আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে!' শুনে রাজা খিল্‌খিল করে হেসে বললেন, 'দেখ তো ওর বাসায় কি আছে।'

তারা দেখে এসে বললে 'মহারাজ, বাসায় একটি টাকা আছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'সে তো আমারই টাকা, নিয়ে আয় সেটা!'

তখুনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এল। সে বেচারা আর কি করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগল—

রাজা বড়ো ধনে কাতর
টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর!

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন 'পাখিটা তো বড়ো ঠ্যাটা রে! যা, ওর টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকা ফিরিয়ে পেয়ে টুনির বড়ো আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

রাজা ভারি ভয় পেল
টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।

রাজা জিগগেস করলেন, 'আবার কি বলছে রে?'

সভার লোকেরা বললে, 'বলছে যে মহারাজ নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

শুনে তো রাজামশাই রেগে একেবারে অস্থির! বললেন, 'কি, এত বড়ো কথা! আন তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই!'

যেই বলা, অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনলে। রাজা তাকে মুঠোয় করে নিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে রানীদের বললেন, 'এই পাখিটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে!'

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রানীরা সাতজনে মিলে সেই পাখিটাকে দেখছেন।

একজন বললেন 'কি সুন্দর পাখি! আমার হাতে দাও তো একবার দেখি।' বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার আর একজন দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত থেকে যখন আর একজন নিতে গেলেন, তখন টুনটুনি ফসকে গিয়ে উড়ে পালাল।

কি সর্বনাশ! এখন উপায় কি হবে? রাজা জানতে পারলে তো রক্ষা থাকবে না!

এমনি করে তাঁরা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ্‌থপ্‌ করে যাচ্ছে। সাত রানী তাকে দেখতে পেয়ে খপ্‌ করে ধরে ফেললেন, আর বললেন, 'চুপ-চুপ! কেউ যেন জানতে না পারে। এইটেকে ভেজে দি, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন টুনটুনিই খেয়েছেন।'





সেই ব্যাঙটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে তিনি খেয়ে ভারি খুশি হলেন।

তার পর সবে তিনি সভায় গিয়ে বসেছেন, আর ভাবছেন, 'এবারে পাখি বাছাকে জব্দ করেছি'।

অমনি টুনি বলছে—

বড়ো মজা, বড়ো মজা,
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!

শুনেই তো রাজামশাই লাফিয়ে উঠেছেন। তখন তিনি থুতু ফেলেন, ওয়াক তোলেন, মুখ ধোন, আর কত কি করেন। তার পর রেগে বললেন, 'সাত রানীর নাক কেটে ফেল।'

অমনি জল্লাদ গিয়ে সাত রানীর নাক কেটে ফেললে।

তা দেখে টুনটুনি বললে—

এক টুনিতে টুনটুনাল
সাত রানীর নাক কাটাল!

তখন রাজা বললেন 'আন বেটাকে ধরে! এবারে গিলে খাব। দেখি কেমন করে পালায়!'

টুনটুনিকে ধরে আনলে।

রাজা বললেন, 'আন জল!'

জল এল। রাজা মুখ ভরে জল নিয়ে টুনটুনিকে মুখে পুরেই, চোখ বুজে চক্ করে গিলে ফেললেন।

সবাই বললে, 'এবারে পাখি জব্দ!'

বলতে-বলতেই রাজামশাই ভোক্ করে মস্ত একটা ঢেকুর তুললেন।

সভার লোক চমকে উঠল, আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালাল।



রাজা বললেন, 'গেল, গেল! ধর, ধর!' অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে আবার বেচারাকে ধরে আনল।

তার পর আবার জল নিয়ে এল, আর সিপাই এসে তলোয়ার নিয়ে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়াল। টুনটুনি বেরুলেই তাকে দু টুকরো করে ফেলবে।

এবার টুনটুনিকে গিলেই রাজামশাই দুই হাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভিতরে গিয়ে ভয়ানক ছট্‌ফট্ করতে লাগল!

খানিক বাদে রাজামশাই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, 'ওয়াক! অমনি টুনটুনিকে সুদ্ধ তাঁর পেটের ভিতরের সকল জিনিস বেরিয়ে এল।

সবাই বললে, 'সিপাই, সিপাই! মারো! মারো! পালাল!'

সিপাই তাতে থতমত খেয়ে তলোয়ার দিয়ে যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তলোয়ার টুনটুনির গায় না পড়ে, রাজামশায়ের নাকে গিয়ে পড়ল।

রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাচালেন। সঙ্গে সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল। তখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচাল।

টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগল—

নাক কাটা রাজা রে
দেখ তো কেমন সাজা রে!

বলেই সে উড়ে সে-দেশ থেকে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এসে দেখল, খালি বাসা পড়ে আছে।

অনুশীলনী

S.C.E.R.T., West Beng
Date 12-7-85
Acc. No. 3315

১। নীচের শব্দদুটির অর্থ শেখো:
কাতর; ঠ্যাটা।

২। একই শব্দের অর্থের পার্থক্য শেখো:

শব্দ	অর্থ	প্রয়োগ
খালি	কেবল, শুধু	টুনটুনি খালি এই কথাই ভাবে।
খালি	শূন্য	টুনটুনির খালি বাসা পড়ে আছে।
খালি	সর্বদা	শিশুটির খালি কান্না, শুনে ভালো লাগে না।

৩। রাজা টুনটুনির বাসায় টাকা ফিরিয়ে দিলেন কেন?
৪। রাজাকে ব্যাঙ ভাজা খেতে হল কেন? এর ফল কি হল?
৫। রাজার নাক কাটা গেল কিভাবে?
৬। 'টুনটুনির বই' থেকে এই ধরনের আরো গল্প পড়ো।

S.C.E.R.T., West
Library
Calcutta

আমাদের পাড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি
আছে আমাদের পাড়াখানি।
দিঘি তার মাঝখানটিতে,
তালবন তারি চারি ভিতে।

বাঁকা এক সরু গলি বেয়ে
জল নিতে আসে যত মেয়ে।
বাঁশ গাছ ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে,
ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি নড়ে।

পথের ধারেতে একখানে
হরিমুদি বসেছে দোকানে।
চাল ডাল বেচে তেল নুন,
খয়ের সুপারি বেচে চুন।

ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি,
খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি।
বিধু গয়লানি মায়ে পোয়
সকাল বেলায় গোরু দোয়।

আঙিনায় কানাই বলাই
রাশি করে সরিষা কলাই।
বড়োবউ মেজোবউ মিলে
ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে।



অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :
চারিভিত ; ভানে ; পেতে।

২। অর্থের পার্থক্য শেখো :
পাড়া —— পাড়াখানি
মাঝ খান —— মাঝখানটি
লোক —— লোকটি
বাসন —— বাসনখানি

৩। "ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি নড়ে" এখানে ঝুরু ঝুরু কথাটির অর্থ কি? এই ধরনের আরো কতকগুলি শব্দ দেওয়া হল। যেটি যেখানে উপযুক্ত, সেখানে বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :—
ঝিরঝিরে ; ঝাঁ ঝাঁ ; গমগমে ; টনটনে।
—— আওয়াজ ; —— বৃষ্টি ; —— ব্যথা ; —— রোদ।

৪। আমাদের পাড়াটি কেমন জায়গায়? হরিমুদির দোকান কোথায়? হরিমুদি কি কি জিনিস বেচে? পাড়ার অন্য লোক কি কি কাজ করে?

৫। ঘোমটা কি? পাড়াখানি ছায়ার ঘোমটা মুখে দিল কি করে?

৬। 'আমাদের পাড়া' কবিতায় পাড়ার যে ছবিটি ফুটে উঠেছে তা রঙ দিয়ে আঁকো।

ছেলেবেলার কথা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

পড়ার বই ছেড়ে আমি যে কখনো বাইরের বই পড়তে চাইব— সে কথা তখন আমি ভাবতেও পারি নি।

কিন্তু কেমন করে যেন বাবার কেনা একটি নাটকের বই আমার নজরে পড়ে যায়। বইটির নাম ছিল শ্রবণের পিতৃভক্তি। এই বইখানা আমি খুব মন দিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম।

সেই সময়ে রাজকোট শহরে একদল লোক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বায়োস্কোপের বাক্সে ছবি দেখিয়ে বেড়াত। একটি ছবি দেখেছিলাম : শ্রবণ কাঁধে ভার বেঁধে তার অন্ধ মা-বাবাকে ডুলিতে বসিয়ে তীর্থে নিয়ে চলেছে।



সেই নাটকের বিষয় আর এই ছবিটি আমার মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে। মনে মনে ঠিক করেছিলাম আমাকেও শ্রবণের মতো হতে হবে। শ্রবণের মৃত্যু হলে তার মা-বাবা কেমন আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন, সে কথা আজও আমি ভুলতে পারি নি। বাবা আমাকে একটি মাউথ-অরগান কিনে দিয়েছিলেন। আমি অরগান-এ সেই বিলাপের সুর বাজাবার চেষ্টা করতাম।



আরো একটি নাটক আমার মনে ঠিক এই-রকম দাগ কেটেছিল। সেই সময়ে রাজকোটে এক যাত্রার দল এসেছিল। বাবার অনুমতি পেয়ে আমি একদিন যাত্রা দেখে আসি। পালা ছিল হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। সেই পালা অনেক-দিন ধরে আমার মন ভরে রেখেছিল। মনে হত বারবার দেখলেও আশা মিটবে না। কিন্তু রোজ রোজ যাত্রা দেখার ছুটি কি মেলে?

হরিশ্চন্দ্রের পালায় দিনের পর দিন আমার মন ডুবে থাকত। কতদিন যে মনে মনে হরিশ্চন্দ্র হয়ে অভিনয় করেছি— তার ঠিকঠিকানা নেই। রাতের পর রাত দিনের পর দিন নিজের মনে প্রশ্ন করেছি, আচ্ছা, সবাই কেন হরিশ্চন্দ্রের মতো সত্যে অনুরাগী হয় না।

আমার ধারণা হয়েছিল হরিশ্চন্দ্র নাটকের প্রত্যেকটি ঘটনা বর্ণে বর্ণে সত্য। সত্যের পথে চলতে হবে, সত্যের জন্য সকল রকম দুঃখকষ্ট বরণ করে নিতে হবে, এই ভাবনা আমায় পেয়ে বসেছিল।

আজকের দিনেও হরিশ্চন্দ্র ও শ্রবণ আমার কাছে জীবন্ত মানুষ। আমি বেশ ভাবতে পারি এই বয়সেও আবার যদি ওই দুটি নাটক পড়তে বসি, আমার দুচোখ জলে ভরে যাবে।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো ও বাক্যে প্রয়োগ করো:
বায়োস্‌কোপ; মাউথ-অরগান; উপাখ্যান; পালা, অনুরাগী; বর্ণে বর্ণে; বিলাপ।

২। বায়োস্‌কোপের বাক্‌সে— দেখা কিসের ছবি গান্ধীজির মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে?

৩। হরিশ্চন্দ্র নাটকটি দেখে দিনের পর দিন বালক গান্ধী নিজের মনে কি প্রশ্ন করেছেন?

৪। হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখার ফলে কোন ভাবনা বালক গান্ধীকে পেয়ে বসেছিল?

৫। স্কুলে সাহিত্য-সভার আয়োজন করে সেখানে রামায়ণ থেকে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান পাঠ করো।

৬। শ্রবণ তার অন্ধ বাবা-মাকে ভারে বসিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছেন, এই রকম একটি ছবি আঁকো।

বাবার চিঠি

বুদ্ধদেব বসু



আমি যদি হতেম ছোটো পাখি
থাকত যদি ছোট্ট দুটি পাখা,
তোমার কাছে উড়ে যেতাম চলে।

শ্রাবণ-মেঘ যেমন দলে-দলে
পার হয়ে যায় ঘন ছায়ায় ঢাকা
মস্ত শহর, পাহাড়, নদী, বন।

বৃষ্টিধারায় হঠাৎ পড়ে গলে
তেমনি আমার সঙ্গীহারা মন
চলেছে আজ হাওয়ার সঙ্গে ছুটে

ছোট্ট তোমার হাত দু-খানির দিকে,
যে-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে গলা
বলেছিলে, 'আমায় চিঠি লিখে

পাঠিয়ে দিয়ো ডাকওয়ালার হাতে।'
হয় নি মিছে ওই কথাটি বলা,
একলা বসে লিখছি তোমায় চিঠি

কাজের শেষে কাজল-কালো রাতে
যদিও তুমি পড়তে শেখোনিকো
বুঝবে নাকি আমার মনের কথা ?



তাড়াতাড়ি জবাব কিন্তু লিখো—
কাগজ ভরে খানিক আঁকিবুঁকি,
অর্থছাড়া বানান-হারা ভাষা,

কালিতে আর ভালোবাসায় মাখা।
থাকত যদি ছোট্ট দুটি পাখা
চিঠি পেয়েই উড়ে যেতাম চলে।

আজ আকাশে যেমন এরোপ্লেন
শহর নদী পাহাড় হয়ে পার
পলকে ধায় দেশে দেশান্তরে,

হঠাৎ নামে বোমার বরিষণে :—
তেমনি আমি হাওয়ার পিঠে চড়ে
টুকরো করে দিতেম অন্ধকারে,



চুপটি করে ঠিক নামতেম গিয়ে
যেখানে তুই ঘরের একটি কোণে
ঘুমিয়ে আছিস আবছা ভোরের আলোয়।

আমি কিন্তু ফেলতেম না বোমা,
চুমো হয়ে ঝরতেম তোর মুখে;
চমকে চেয়ে বলতিস তুই, 'ও মা!

দেখো চেয়ে, এসেছেন যে বাবা!'
মা বলতেন, 'কী যে বলিস, হাবা,
বাবা এখন কোত্থেকে আসবেন!'

হায় রে ভাগ্য! হায় রে এরোপ্লেন!
বোমা ফেলতে কতই দূরে যায়!
আমার তবু হয় না কেন ওড়া?

মনে জানি, মিথ্যে এ-সব ভাবা।
ভাগ্যে তবু এ মিথ্যেটা আছে
অতি কষ্টে তাই তো জীবন বাঁচে।

ইতি—তোমার হাত-পা-বাঁধা বাবা।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ ও বানান শেখো :
শ্রাবণ-মেঘ; সঙ্গীহারা; অর্থছাড়া; দেশান্তরে; কাজল-কালো; বরিষণে।

২। এই শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখো :—
কালো; অন্ধকার; আবছা; হাবা।

৩। ছোট্ট খোকা বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কি বলেছিল?

৪। বাবা ছোটো দুটি পাখা চাইছেন কেন?

৫। 'মনে জানি, মিথ্যে এ-সব ভাবা'— বাবার মনের ভাবনা কি? এ-সব ভাবনাকে তিনি মিথ্যে বলছেন কেন?

৬। (ক) 'ভাগ্যে তবু এ মিথ্যেটা আছে
অতিকষ্টে তাই তো জীবন বাঁচে।'
— কোনটা মিথ্যে? এই মিথ্যেটার জন্যই বাবার জীবন কেমন করে বাঁচছে বুঝিয়ে বলো।
(খ) 'ইতি তোমার হাত-পা-বাঁধা বাবা' — চিঠির শেষে এ কথা বাবা লিখলেন কেন?

গাছের বীজ কী করে ছড়ায়

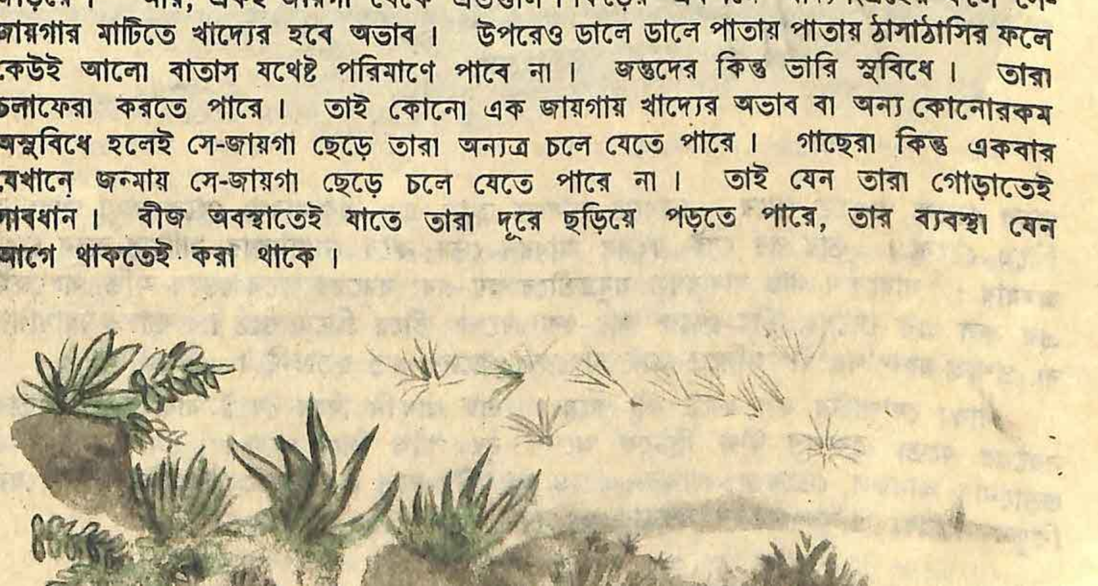
পুণ্যময় সেন



ফাল্গুন-চৈত্রের দুপুর বেলার হাওয়ায় বুড়ির-সুতো উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে দু-একটা উড়ে ঘরের ভিতরেও চলে আসে। দেখতে পেলেই ছেলেমেয়েরা ছোটে ফুঁ দিয়ে ওড়াবার জন্য। এদের হাতে নিলে দেখা যায় যে এরা এক-একটি বীজ এবং তারই গা থেকে বেরিয়েছে লম্বা লম্বা রেশমের মতো অনেকগুলি সরু শুঁয়ো। এই শুঁয়ো-গুলির জন্যই এরা হাওয়ায় ভাসে। হাওয়ায় ভেসে এরা অনেক দূরে যায় এবং হাওয়ার বেগ কমে গেলে অথবা কোথাও বাধা পেলে মাটিতে পড়ে যায়। যেখানে পড়ে সেখানেই জল পেলে এই বীজ থেকে গাছ হয়।

প্রাণীমাত্রেই চেষ্টা করে নিজেকে এবং নিজের বংশকে রক্ষা করতে। বাঁচতে গেলে খাদ্যের দরকার। গাছেরা খাদ্য জোগাড় করে কতক মাটি থেকে এবং কতক বাতাস থেকে। তবে মাটি ও বাতাস থেকে তারা যা নেয় তা কাঁচামালের মতো। গাছ তাকে খাওয়ার উপযোগী করে নেয় সূর্যের আলোর সাহায্যে। তাই গাছকে বাঁচতে হলে চাই মাটির রস, বাতাস আর আলো। সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে এই তিনটি জিনিসই গাছের যথেষ্ট পরিমাণে দরকার। এই তিনটি জিনিস নিয়ে নিজেদের মধ্যে যাতে কাড়াকাড়ি মারামারি না করতে হয়, তাই যেন সব গাছেরই চেষ্টা ফাঁকা জায়গায় থাকবার।

কোনো একটি গাছের বীজ দূরে ছড়িয়ে না পড়ে কেবলই যদি তার গুঁড়ির কাছে মাটিতে জমা হতে থাকে, তা হলে কিছুদিনের মধ্যেই গাছে গাছে বেজায় ঘেঁষাঘেঁষি হবে। তাদের পক্ষে তখন প্রাণ বাঁচানো কঠিন হয়ে উঠবে। মাটির ভিতরে শিকড়ে শিকড়ে যাবে জড়িয়ে। আর, একই জায়গা থেকে এতগুলি শিকড়ের একসঙ্গে খাদ্যসংগ্রহের ফলে সে-জায়গার মাটিতে খাদ্যের হবে অভাব। উপরেও ডালে ডালে পাতায় পাতায় ঠাসাঠাসির ফলে কেউই আলো বাতাস যথেষ্ট পরিমাণে পাবে না। জন্তুদের কিন্তু ভারি সুবিধে। তারা চলাফেরা করতে পারে। তাই কোনো এক জায়গায় খাদ্যের অভাব বা অন্য কোনোরকম অসুবিধে হলেই সে-জায়গা ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে যেতে পারে। গাছেরা কিন্তু একবার যেখানে জন্মায় সে-জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে না। তাই যেন তারা গোড়াতেই সাবধান। বীজ অবস্থাতেই যাতে তারা দূরে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তার ব্যবস্থা যেন আগে থাকতেই করা থাকে।



যে বুড়ির-সুতোর কথা আগে বলা হয়েছে তারা একটিমাত্র গাছের বীজ নয়, তারা নানা জাতের গাছের বীজ। আকন্দ, ছাতিম, কুরচি, মালতী প্রভৃতি অনেক গাছের বীজই তুলোর মতো শুঁয়োর সাহায্যে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। শিমুল-কাপাসের ফল পাকলেই আমরা তুলো পেড়ে নিই আমাদের দরকারে। তা না হলে তাদের বীজও বুড়ির-সুতো হয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে দেখা যেত।

আর-এক জাতের বীজও হাওয়ায় উড়ে যায়। এদের বলা চলে ডানাওয়ালা বীজ। গায়ে এদের ডানা থাকে, যেমন সজনে, মেহগনি ও মুচকুন্দ ফলের বীজ। মাধবী ও শালের বেলায় বীজসুদ্ধ আস্ত ফলটি হাওয়ায় ভাসে, কারণ এদের ডানা বীজের গায়ে না হয়ে ফলের গায়ে হয়। মাধবী-ফলের ডানা তিনটি, আর শাল-ফলের হয় পাঁচটি। এই ডানায় ভর করে এদের বীজসুদ্ধ ফল হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে খেতে উড়ে দূরে গিয়ে পড়ে। বর্ষাকালে ফলের আবরণ পচে গেলে বীজ থেকে এদের গাছ বেরোয়। শিশু গাছের ফল শুঁটিজাতীয়। বীজসুদ্ধ সমস্ত শুঁটিটাই তার ডানার মতো চ্যাপটা ও পাতলা। তাই আস্ত ফলটাকেই হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়।

যে-সব গাছ জলে বা জলের ধারে হয় তার মধ্যে অনেকেরই বীজ-ছড়ানোর কাজ করে জল। নারকেল, সুপারি ইত্যাদি গাছ সাধারণত জলাশয়ের ধারে হয়। ঝুনো হলে এদের ফল বীজসুদ্ধ জলে পড়ে যায়। গায়ে ছোবড়া থাকায় এরা বেশ সহজেই



জলে ভেসে থাকতে পারে। ভাসতে ভাসতে ক্রমে এরা একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে ঠেকে। তার পর সেই ফলের আবরণ ভেদ করে সেখানকার মাটিতে নতুন চারা জন্মায়। নারকেল গাছ সাধারণত সমুদ্রতীরে হয় এবং সমুদ্রের জলে ভেসে অতি সহজেই এর ফল এক দেশের তীর থেকে আর-এক দেশের তীরে গিয়ে ওঠে। ভারত-মহাসাগর বা প্রশান্ত-মহাসাগর দ্বীপগুলিতে তাই নারকেল গাছের এত ছড়াছড়ি।

পাকা দোপাটির ফল ফাটে ফট্ করে। এই ঝাঁকুনি দিয়ে ফেটে যাবার ফলে, তার সরষের মতো একরাশ বীজ ছিটকে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পড়ে। এমনি করে বীজ ছড়ানোয় আমরুল, ভেরেণ্ডা, কাঞ্চন—এরাও দোপাটির দলে। বীজ ছড়াবার কাজে বাইরের কিছুর সাহায্য এ-সব গাছের দরকার হয় না।

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মাঠে বেড়াতে গেলে কাপড়ে চোরকাঁটা লাগে। এই চোর-কাঁটা কয়েকরকম ঘাসের ফল, এদের ভিতর থাকে বীজ। মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর গায়ে লেগেই এরা একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। চর্‌চরি বা আপাঙের ছোটো ছোটো ফলও এরকম করেই ছড়ায়। বাঘনখের ফল নিজের বাঁকানো ধারালো নখজোড়া দিয়ে গোরু-মোষের গায়ে ঝুলতে ঝুলতে যায়।

আম, জাম, খেজুর, কাঁঠাল ইত্যাদি শাঁসওয়ালা ফল অনেক জীবেরই খাদ্য। খেতে গিয়ে এলোমেলো আঁটি ফেলে তারাই এদের ছড়িয়ে দেয়। পুরনো দেয়ালে, ছাদের কার্নিশের ফাঁকে এবং তাল-গাছের গায়ে প্রায় বট-অশ্বত্থের গাছ হতে দেখা যায়। কাক, শালিক ইত্যাদি পাখিই তার জন্য দায়ী। পাখিরা বট-অশ্বত্থের ফল খায়, কিন্তু তার বীজ এদের পেটে হজম হয় না, মলের সঙ্গে আস্তই বেরিয়ে আসে। ফলে অনেক সময় নানা অস্থানেও এ-সব গাছ হয়। কুল, পেয়ারা, খেজুর, এদের বীজও অনেক সময় জন্তুর পেটে হজম হয় না। তারাই এদের চারি দিকে ছড়ায়।

অনেক গাছ মানুষের হাত দিয়ে পৃথিবীতে নানা জায়গায় ছড়িয়েছে। অনেক গাছ আমাদের দেশে আগে কোনোদিনই ছিল না, অথচ এখন প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এদের এনেছে মানুষ। আনারস, পেঁপে, আলু, তামাক, লঙ্কা ইত্যাদি গাছ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যে কচুরিপানা আজ আমাদের দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নদী খাল বিলের সর্বনাশ করছে তার আমদানিও বেশি দিনের নয়। শোনা যায়, একজন বিদেশী ভদ্রমহিলা এর সুন্দর নীল ফুলের রূপে মুগ্ধ হয়ে আমাদের দেশে একে এনেছিলেন সুদূর বিদেশ থেকে।



অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ ও প্রয়োগ শেখো :
বুড়ির-সুতো, কাঁচামাল, উপযোগী, একরাশ, অস্থানে, উল্লেখযোগ্য, আমদানি, সংগ্রহ, আবরণ, অন্যত্র, প্রচুর।

২। নীচের বাক্যেগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করো :
প্রাণীমাত্রেই —— করে নিজেকে এবং নিজের —— রক্ষা করতে। ——গেলে —— দরকার। গাছেরা —— জোগাড় করে কতক —— থেকে এবং কতক —— থেকে।

৩। গাছকে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে কোন কোন জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে দরকার?

৪। গাছের বীজ দূরে ছড়িয়ে না পড়ে তার গুঁড়ির কাছে মাটিতে জমা হলে কি কি অসুবিধা হবে?

৫। কোন কোন গাছের বীজ তুলোর মতো হাওয়ায় ওড়ে?

৬। কোন কোন বীজকে ডানাওয়ালা বীজ বলে?

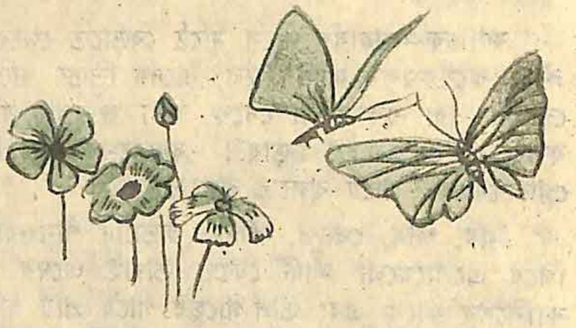
৭। সাগর-মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে নারকেল গাছের এত ছড়াছড়ি কেন?

৮। মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু এবং পাখি কিভাবে বীজ ছড়াতে সাহায্য করে থাকে?

৯। তোমাদের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন রকমের বীজ সংগ্রহ করে স্কুলে প্রদর্শনী করো। স্কুলের বাগানে দোপাটি গাছ লাগাও এবং কিভাবে এর বীজ ছড়ায় তা লক্ষ্য করো।

সাধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



কত দিন ভাবে ফুল,
উড়ে যাব কবে,
যেথা খুশি সেথা যাব,
ভারি মজা হবে।
তাই ফুল একদিন
মেলি দিল ডানা।
প্রজাপতি হল, তারে
কে করিবে মানা ?

রোজ রোজ ভাবে বসে
প্রদীপের আলো,
উড়িতে পেতাম যদি
হত বড়ো ভালো।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে
কবে পেল পাখা
জোনাকি হল সে, ঘরে
যায় না তো রাখা।

পুকুরের জল ভাবে.
চুপ করে থাকি—
হায়, হায়, কী মজায়
উড়ে যায় পাখি।
তাই একদিন বুঝি
ধোঁয়া-ডানা মেলে
মেঘ হয়ে আকাশেতে
গেল অবহেলে।

আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে
মাঠ হব পার।
কভু ভাবি, মাছ হয়ে
কাটিব সাঁতার।
কভু ভাবি, পাখি হয়ে
উড়িব গগনে।
কখনো হবে না সে কি
ভাবি যাহা মনে ?

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো ও ব্যবহার শেখো :
মানা করা, আদেশ মানা ; ডানা ; ধোঁয়া-ডানা ; গগন।

২। এই বাক্যগুলোতে নীচে-দাগ-দেওয়া কথার মানের পার্থক্য শেখো :
(ক) ভারি মজা হবে।
(খ) লোহা ভারী পদার্থ।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করো :
রোজ রোজ ——— বসে
——— আলো,
——— পেতাম যদি
হত বড়ো ——— ।

৪। পাখিকে দেখে পুকুরের কি মনে হয়েছিল ?

৫। কবিতাটি আবৃত্তি করার জন্য মুখস্থ করো।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রবিচিত্র' বই থেকে এই ধরনের আরো কবিতা পড়ো।

বাঘ আর হাতির লড়াই

জিম করবেট



একদিন টনকপুরের দুজন মাঝি সারদা নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছে। তাদের ইচ্ছা ছিল তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে যাবে, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। নদী থেকে দু মাইল দূরে গ্রাম ; যখন তারা রওনা হল, সূর্য অস্ত গেছে। ঘন ঘাসের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তারা দেখে নালার ওপারে দুটো বাঘ দাঁড়িয়ে রয়েছে। নালাটা এখানে চল্লিশ গজের মতো চওড়া, জল তাতে সামান্য। যে পথে মাঝিদের যেতে হবে, বাঘ দুটো সেখানেই। তাই তারা ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে গুড়িশুঁড়ি মেরে বসে রইল আর বাঘ কখন সরে যাবে তার অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকবার বাঘ দেখেছে এরা, তাই অযথা ভয় পায় নি।

অল্প কিছুক্ষণ আগে সূর্য ডুবেছে, আকাশে তখনো কিছুটা অস্তরবির আলো রয়ে গিয়েছে। এই সময়ে পিছন দিক থেকে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল ; চাঁদের আলোয় বাঘ-দুটোকে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। এমন সময় মাঝিরা যে ঘাস-জঙ্গল পার হয়ে এসেছে, তার মধ্য থেকে কি যেন নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল। খানিক পরেই বেরিয়ে এল বিরাট্ এক হাতি, তার দাঁত দুটি প্রকাণ্ড। এই দাঁতাল হাতিটিকে টনকপুরের সকলেই চিনত। এর অভ্যাস ছিল বন-বিভাগের বাংলোর কাঠের খুঁটিগুলি উপড়ে তুলে ঘর ফেলে দেওয়া। এজন্য সবাই এর উপর বিরক্ত। তবে এ কখনো মানুষ মারে নি, তাই একে ঠিক গুণ্ডা হাতি বলা যায় না।

নালার মধ্যে নেমে হাতিটি অপর পারে বাঘদুটিকে দেখতে পেল। তখনই সে শুঁড় উঁচু করে তুলে ভীষণরবে গর্জন করতে করতে বাঘের দিকে অগ্রসর হল। বাঘেরাও রুখে দাঁড়াল। হাতি যখন এগিয়ে গেল, একটি বাঘ থাকল তার সামনে, অন্যটি ঘুরে পিছন দিক দিয়ে এসে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল হাতির পিঠে। হাতি যেমনি মাথা ঘুরিয়ে শুঁড় দিয়ে পিঠের উপরকার বাঘকে ধরতে গেছে, অমনি সামনেরটি তার মাথার উপর লাফিয়ে পড়ল। হাতি এবার রাগে চিৎকার করতে লাগল, বাঘেরাও গলা ছেড়ে গর্জন করতে লাগল। বাঘ যখন রাগের বশে গর্জন করে, তা শুনতে হয় ভয়ংকর ; এর সঙ্গে পাগলপ্রায় হাতির গর্জন যখন মিশল, এমন ভীষণ শব্দের সৃষ্টি হল যে, মাঝি দুজন ঘাবড়ে গিয়ে জাল মাছ সব ফেলে টনকপুরের দিকে প্রাণপণে দিল ছুট।

এই লড়াইয়ের আওয়াজ টনকপুরে যখন শোনা গেল তখন গ্রামে রাত্রির আহারের আয়োজন হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে মাঝিরা হাতি আর বাঘের লড়াইয়ের খবর নিয়ে পৌঁছল। তখন জনকয়েক সাহসী লোক লড়াই দেখতে নদীর তীরে গেল। কিন্তু যখন তারা বুঝল যে, লড়িয়েরা লড়াই করতে করতে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে, সবাই মরি-বাঁচি করে ছুটল বাড়ির দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টনকপুরের প্রতিটি বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কতক্ষণ যুদ্ধ চলেছিল সে বিষয়ে সকলেই একমত নয়। কারো মতে লড়াই চলেছিল সারারাত ধরে, কারো মতে মাঝরাতে লড়াই থেমে যায়। যেখানটায় লড়াই হচ্ছিল ঠিক তার উপরে নদীর উঁচু পাড়ে ছিল ম্যাথেসনের বাংলো-বাড়ি। তিনি বলেন, এ লড়াই চলেছিল বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে, আর এমন ভয়ংকর শব্দ জীবনে কোনোদিন তিনি নাকি শোনেন নি। রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, কিন্তু তা ম্যাথেসনের, না পুলিসের সেটা বোঝা যায় নি। তবে এতে কোনো ফল হয় নি। লড়াই থামে নি, লড়িয়েরাও ওখান থেকে চলে যায় নি।

সকাল বেলায় টনকপুরের লোকেরা আবার সেই উঁচু জায়গায় গিয়ে হাজির হল। দেখা গেল নদীপাড়ের নীচে একশো ফুট মতো পাথরের নুড়ি বিছানো জায়গায় হাতিটা মরে পড়ে আছে। নায়েব-তহশিলদারদের কাছে হাতির আঘাতের যে বর্ণনা শুনলাম তাতে বুঝলাম অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে হাতিটা মারা গেছে। হাতির শরীরের কোনো অংশ বাঘেরা খায় নি; সেখানে বা টনকপুরের কাছাকাছি কোথাও আহত বা মৃত বাঘও দেখা যায় নি। হাতিটার দাঁতদুটির ওজন ছিল নব্বই পাউণ্ড।

আমার মনে হয় দ্বিতীয় বাঘটা হাতির মাথায় লাফিয়ে উঠেই থাবা দিয়ে তার চোখদুটি উপড়ে ফেলেছিল। এর ফলে অন্ধ হাতি এদিক ওদিক এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি করে নদীর পাড়ের কাছে এসে পড়েছিল। এখানে ছড়ানো ছিল গোল গোল পাথরের নুড়ি। এর উপর সে পা ঠিক রাখতে পারে নি, তাই বেকায়দায় পা হড়কে গিয়ে সে বাঘেদের সম্পূর্ণ আওতায় পড়ে গিয়েছিল। লড়াইতে বাঘেরাও কিছুটা আঘাত পেয়েছিল, তার ফলে তাদের রাগ হয়েছিল প্রচণ্ড. হাতিকে শেষ না করে তারা ছাড়ে নি।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো:
অতিরিক্ত; রক্তপাত; আহত; বিরক্ত; ভীষণরবে।

২। বাঘদুটি কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল? হাতি কিভাবে তাদের দিকে এগিয়ে গেল? বাঘেরা তখন কি করল?

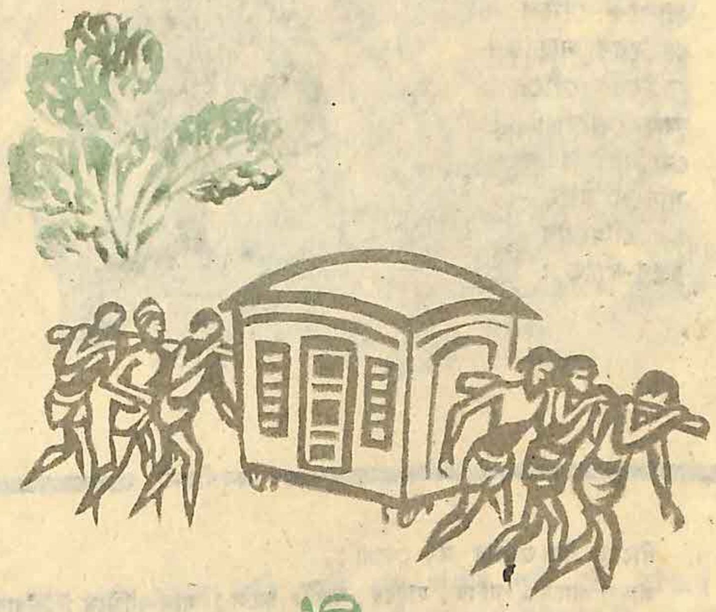
৩। বাঘের চেয়ে হাতির গায়ের জোর বেশি; তবু কি কি কারণে এই দাঁতাল হাতিটি মারা পড়েছিল?

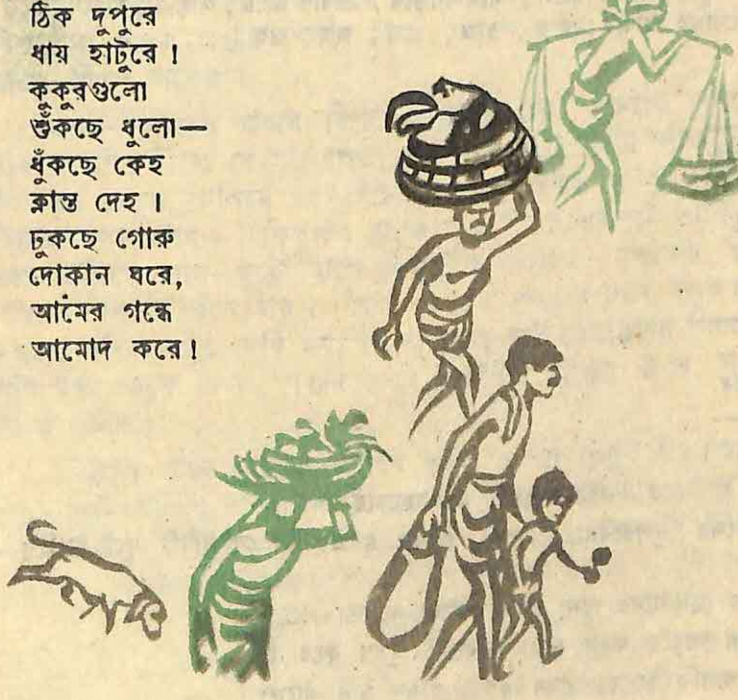
৪। বাঘের সঙ্গে হাতির লড়াই-এর তিনটি ছবি আঁকো:
(ক) লড়াই শুরু হচ্ছে;
(খ) লড়াই চলেছে;
(গ) লড়াই শেষ হয়েছে।

পালকির গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

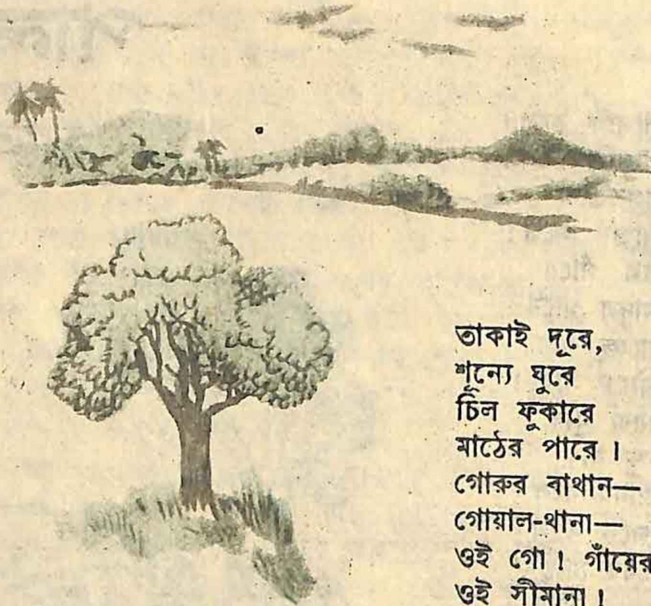
পালকি চলে!
পালকি চলে!
গগনতলে
আগুন জ্বলে!
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!
ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি
পাটায় বসে
ঢুলছে কসে!
দুধের চাঁছি
শুষছে মাছি—
উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে।
আসছে কারা
হনহনিয়ে?
হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক দুপুরে
ধায় হাটুরে!
কুকুরগুলো
শুঁকছে ধুলো—
ধুঁকছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।
ঢুকছে গোরু
দোকান ঘরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে!





পালকি চলে,
পালকি চলে—
দুলকি চালে
নৃত্য তালে!
ছয় বেহারা—
জোয়ান তারা—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ বাড়িয়ে
নামল মাঠে
তামার টাটে!

তপ্ত তামা—
যায় না থামা—
উঠছে আলে
নামছে গাড়ায়—
পালকি দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায়!
ঢেউয়ের দোলে
অঙ্গ দোলে!
মেঠো জাহাজ
সামনে বাড়ে—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে।



তাকাই দূরে,
শূন্যে ঘুরে
চিল ফুকারে
মাঠের পারে।
গোরুর বাথান—
গোয়াল-থানা—
ওই গো! গাঁয়ের
ওই সীমানা।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো:

আদুল গায়ে; পাটায়; হাটুরে; দুলকি চালে; আগ-বাড়িয়ে; তামার টাটে; গাড়ায়; সামনে বাড়ে; চরণ-দাঁড়ে; ফুকারে; গোরুর বাথান; রুক্ষ; ক্লান্ত; তপ্ত; অঙ্গ; স্তব্ধ।

২। শূন্যস্থান পূরণ করো

ছয় ————
জোয়ান ————
———— ছাড়িয়ে
————
———— মাঠে
———— টাটে
———— তামা
যায় না ————
উঠছে ————
———— গাড়ায়
পালকি ————
———— নাড়ায়।

৩। পালকি কেমন জিনিস? একে 'মেঠো-জাহাজ' বলা হয়েছে কেন?

৪। এই কবিতায় গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলায় গ্রামের জীবন ও প্রকৃতির যে ছবিটি ফুটে উঠেছে— তা বর্ণনা করো।

৫। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছোটোদের জন্য লেখা আরো কবিতা পড়ো।

৬। স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করার জন্য কবিতাটি মুখস্থ করো।

৭। মাঠের মাঝখান দিয়ে পালকি চলেছে এমন একটি রঙিন ছবি আঁকো।

গণ্ডার-শিকার

তেজেশচন্দ্র সেন



খুব বড়ো একটা কাজ করে এলে আমরা বলি, মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। শিকারীরা জানে গণ্ডার শিকার করা কেমন শক্ত কাজ। ভাণ্ডার লুট করার মতোই তাতে বিপদ অনেক।

গণ্ডার-শিকারের প্রধান বিপদ গণ্ডারের গোঁ, একবার চাপলে তার কাছে যায় সাধ্য কার। শিকারীকে দেখতে পেলে প্রথম সে চেষ্টা করে পালাতে। কিন্তু পালাতে গিয়ে যখন সে বোঝে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো শক্ত, তখন সে মুখ ঘুরিয়ে শিকারীর দিকে ফিরে দাঁড়ায় সোজা হয়ে। কিছুক্ষণ থাকে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। তার পরেই নাকের খড়্গ বাগিয়ে সোজা ছুটে আসে শিকারীর দিকে। বন্দুকের গুলিতে তাকে কাবু করতে পারলে শিকারী বেঁচে যায়। যদি সে ভয় পায়, হাতের বন্দুক যদি একবার কাঁপে, গুলি ছুঁড়তে যদি একটুও দেরি হয়, কিংবা গুলি যদি বেজায়গায় গিয়ে লাগে, তা হলে শিকারীর আর রক্ষা থাকে না। গণ্ডার তখন শিকারীর ঘাড়ের উপর পড়ে খড়্গের গুঁতোয় তাকে ছিঁড়ে ফেলে।

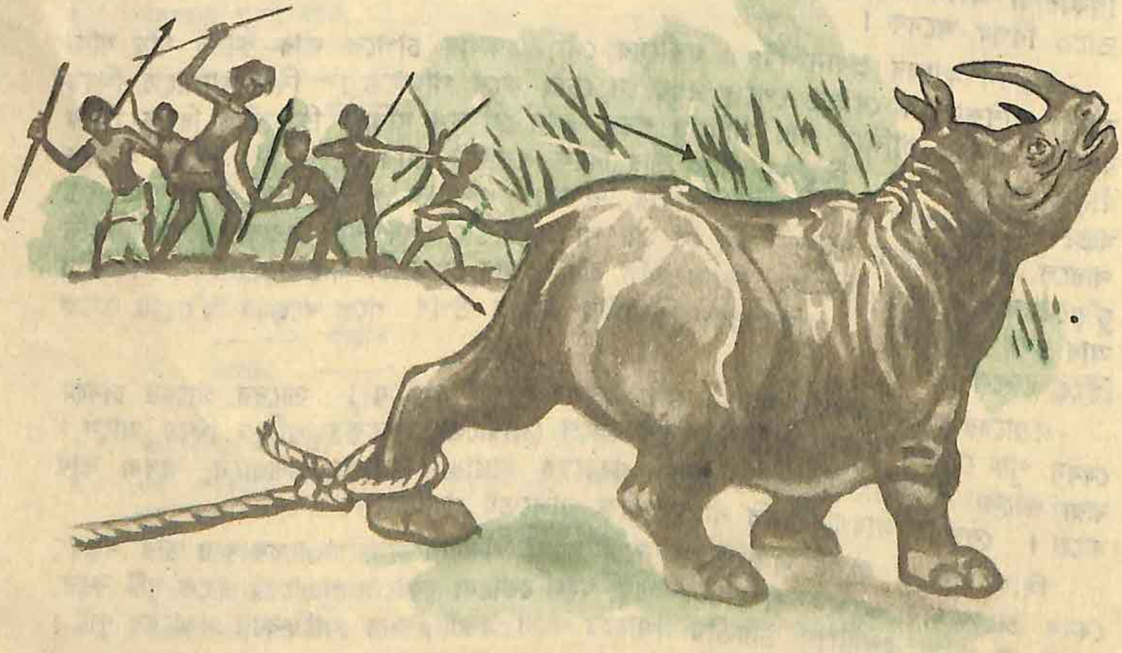
গণ্ডারের গায়ে যেখানে-সেখানে গুলি করলে কিছুই হয় না। তাদের গায়ের চামড়া যেমন পুরু তেমনি শক্ত। সেই চামড়ায় লেগে জোরালো বন্দুকের গুলিও ফিরে আসে। যারা ভালো শিকারী তারা গুলি করে গণ্ডারের মাথায় দু চোখের মাঝখানে, অথবা তার ঘাড়ে। সেরকম জায়গায় গুলি লাগলে এক গুলিতেই গণ্ডার শেষ।

সিংহ বাঘ বা বনের অন্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য গণ্ডারের অস্ত্র তার খড়্গ; যেমন তাতে ধার তেমনি তা শক্ত। এই খড়্গ কোনো কোনো গণ্ডারের থাকে দুটি করে, কারো বা থাকে একটি। ভারতীয় গণ্ডারের খড়্গ একটি, আর আফ্রিকার গণ্ডারের দুটি।

এই খড়্গাটি একটি অদ্ভুত জিনিস। শুনলে অবাক হবে, গণ্ডারের খড়্গ আগাগোড়া লোম দিয়ে তৈরি। লোমগুলি আছে পরস্পরের গায়ে মিশে অত্যন্ত আঁট হয়ে। তাতেই শক্ত হয়েছে হাড়ের মতো। খড়্গাটি কিন্তু হাড় নয়, নাকের উপর বসানো আছে আলগাভাবে। শিমুল গাছের কাঁটা যেমন শিমুলের ছালের উপর আলগা বসানো থাকে, এও তেমনি। গণ্ডার মেরে চার-পাঁচ দিন ফেলে রাখার পর যদি খড়্গ ধরে টান দেওয়া যায়, তা হলে মাথা থেকে খড়্গাটি আলগা হয়ে উঠে আসে।

গণ্ডারের চামড়াও খুব অদ্ভুত জিনিস। এমন শক্ত, এমন পুরু চামড়া অন্য কোনো জন্তুর নেই। ভারতীয় গণ্ডারের চামড়া দুভাঁজ হয়ে পিঠে লেগে থাকে। আফ্রিকার গণ্ডারের চামড়া এমন ভাঁজ করা নয়— মোষের চামড়ার মতো নিটোল। গণ্ডারের চামড়া দিয়ে ঢাল তৈরি হয় খুব চমৎকার। প্রাচীন কালের অনেক লড়িয়ে লোক গণ্ডারের ঢাল ব্যবহার করত। এখনো আফ্রিকার বন্য জাতিরা লড়াই বা শিকারের সময় এই ঢাল ব্যবহার করে থাকে।

আফ্রিকার বন্য জাতিরা গণ্ডার শিকার করে তার চামড়া ও মাংসের লোভে। গণ্ডারের খড়্গাও তাদের কাছে খুব আদরের জিনিস। এই খড়্গা দিয়ে তারা তলোয়ারের বাঁট তৈরি করে। সে বাঁট দেখতেও যেমন সুন্দর, শক্তও হয় তেমনি। কিন্তু খড়্গা ও চামড়ার চেয়ে গণ্ডারের মাংসের প্রতিই বন্যদের বেশি লোভ। একটা গণ্ডার শিকার করতে পারলে, সেদিন তাদের পল্লীতে আনন্দের ধুম পড়ে যায়। তখন তিন-চার দিন ধরে চলে নাচ গান বাজনা আর ভোজ।



বন্যেরা গণ্ডার শিকার করে কেমন করে? তাদের তো বন্দুক নেই, তীর ধনুক ও বর্শাই তাদের প্রধান অস্ত্র। একটা-দুটো তীর বা বর্শা গায়ে বিঁধলে গণ্ডারের কিছুই হয় না। তাই তারা বুদ্ধি খাটিয়ে এক উপায় বের করেছে। খুব শক্ত একটা দড়ির মাথায় তারা বাঁধে একটা বেশ ভারী কাঠ, অন্য মাথায় লাগায় একটা ফাঁস। সেই দড়িটা তারা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রাখে গণ্ডারের চলার পথে। যদি গণ্ডারের পা কোনো রকমে দড়ির ফাঁসে আটকা পড়ে তা হলে গণ্ডার-মশায় পড়েন বাঁধা। দড়ির অন্য মাথায় অত্যন্ত ভারী একটা কাঠ বাঁধা থাকায় ছুটতেও পারে না। আবার এমনও হয়, ছোটবার সময় দড়িবাঁধা কাঠটা জঙ্গলের মধ্যে গাছের গুঁড়িতে যায় আটকে। শিকারীরা কাছেই কোথাও ঝোপের আড়ালে থাকে লুকিয়ে। যেমনি গণ্ডার ফাঁদে পড়া অমনি তারা হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে ছুটে আসে। চারি দিক থেকে তার উপর তীর আর বর্শা পড়তে থাকে আর বেচারা চিৎকার করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণ হারায়। তখন দা কুড়ুল নিয়ে শিকারীর দল লেগে যায় মাংস কাটতে। কেউ কেউ আবার কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালে। ভিড় জমে যায়। আগুনে ঝলসানো গণ্ডারের মাংস দিয়ে মস্ত ভোজ হয়।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো ও বাক্যে প্রয়োগ করো:
বন্য; জোরালো; কাবু; প্রাচীন; ঝলসানো।

২। ভুল কথাটি কেটে দাও:—
নমুনা: গণ্ডারের গায়ের চামড়া যেমন পুরু / ~~পাতলা~~ তেমনি ~~নরম~~ / শক্ত।

(ক) যারা ভালো শিকারী তারা গুলি করে গণ্ডারের মাথায় দু চোখের উপরে / মাঝখানে, অথবা তার ঘাড়ে / পায়ে।

(খ) সিংহ, বাঘ বা বনের অন্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য গণ্ডারের অস্ত্র তার খড়্গ / দাঁত।

(গ) ভারতীয় গণ্ডারের খড়্গ একটি / দুটি, আর আফ্রিকার গণ্ডারের একটি / দুটি।

(ঘ) গণ্ডারের চামড়া দিয়ে ঢাল / জুতো তৈরি হয় চমৎকার।

(ঙ) গণ্ডারের খড়্গ আগাগোড়া লোম / হাড় দিয়ে তৈরি।

(চ) কিন্তু খড়্গ ও চামড়ার চেয়ে গণ্ডারের মাংসের / হাড়ের প্রতিই বন্যদের বেশি লোভ।

৩। মূল বাক্যের অর্থ বজায় রেখে বন্ধনীর মধ্যেকার পদগুলি ব্যবহার করো:

(ক) ভয় পেলে শিকারীর আর রক্ষে থাকে না। (যদি —— তা হলে ——)
(খ) গণ্ডারের গায়ের চামড়া পুরু ও শক্ত। (—— যেমন —— তেমন ——)
(গ) ভালো শিকারীরা গুলি করে গণ্ডারের দু চোখের মাঝখানে। (যারা —— তারা——)
(ঘ) গণ্ডার ফাঁদে পড়লেই তারা হৈ-হৈ করে ছুটে আসে। (যেমনি —— অমনি ——)

৪। গণ্ডার শিকারের প্রধান বিপদ কি?

৫। গণ্ডারের ছবি এঁকে তাতে রঙ দাও।

ফাল্গুন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ফাল্গুনে বিকশিত
কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত
আম্রমুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি
গুঞ্জরি গায়,
বেণুবনে মর্মরে
দক্ষিণবায়।

স্পন্দিত নদীজল
ঝিলিমিলি করে
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি
বালুকার চরে।
নৌকা ডাঙায় বাঁধা,
কাণ্ডারী জাগে,
পূর্ণিমা রাত্রির
মত্ততা লাগে।

খেয়াঘাটে ওঠে গান
অশ্বথ তলে,
পান্থ বাজায়ে বাঁশি
আনমনে চলে।
ধায় সে বংশীরব
বহুদূর গাঁয়
জনহীন প্রান্তর
পার হয়ে যায়।

দূরে কোন শয্যায়
একা কোন্ ছেলে
বংশীর ধ্বনি শুনে
ভাবে চোখ মেলে—
যেন কোন্ যাত্রী সে,
রাত্রি অগাধ
জ্যোৎস্নাসমুদ্রের
তরী যেন চাঁদ
চলে যায় চাঁদে চড়ে
সারা রাত ধরি,
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে
ছুঁয়ে যায় তরী।
রাত কাটে, ভোর হয়,
পাখি জাগে বনে
চাঁদের তরণী ঠেকে
ধরণীর কোণে।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ ও বানান শেখো :
বিকশিত ; পুঞ্জিত ; গুঞ্জরি ; বেণুবন ; মর্মরে; দক্ষিণবায়; স্পন্দিত : কাণ্ডারী ; মত্ততা ; পান্থ ; আনমনে ; ধায় ; রব ; প্রান্তর ; অগাধ ; তরণী।

২। এখানে কয়েকটি বাক্য দেওয়া হল। নীচে-দাগ-দেওয়া কথাগুলির অর্থের পার্থক্য শেখো :
(ক) রূপকথার রাজপুত্র পক্ষিরাজে চড়ে দেশান্তরে বেরোত।
ছেলেগুলো গাছে চড়ে আম পাড়ছে।
গোরুগুলি মাঠে চরে বেড়ায়।
নদীর চরে তরমুজ ভালো হয়।
(খ) রাত কাটে, ভোর হয়।
কাঠুরে কাঠ কাটে।
বুড়ী চরকায় সুতো কাটে।
ময়রা দুধ থেকে ছানা কাটে।

৩। ফাল্গুন মাসে কাঞ্চনগাছে, আমগাছে ও বেণুবনে কেমন অবস্থা হয় ?

৪। ছেলেটি শয্যায় শয়ন করে বংশীর ধ্বনি শুনে কী ভাবে ?

৫। আবৃত্তি করার জন্য কবিতাটি মুখস্থ করো।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রবিচিত্র' বই থেকে এই ধরনের আরো কবিতা পড়ো।

আমাদের দেশ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত



সুজয়ের দেশ বর্ধমান জেলায়। জন্মাবধি কলকাতায় থাকে, দেশের বাড়িতে কখনো যায় নি। দিদির বিয়ে উপলক্ষে এবারই প্রথম গেল। তার দশ বছরের জীবনে এত আনন্দ সে কখনো পায় নি। কলকাতার পাথর-বাঁধানো রাস্তা আর ইঁটের দেয়াল ছাড়িয়ে দেশটা যেখানে দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে সবুজ চাদরে গা ঢেকে শুয়ে আছে তার সঙ্গে এই প্রথম তার চাক্ষুষ পরিচয় হল। এমন ঘন সবুজ কোনো কালে সে দেখে নি। রেল-লাইনের দুধারে যতদূর চোখ যায় সবুজ ধানের খেত। কচি বাঁশের ঝাড় হাওয়ায় দুলছে।

যা দেখছে তাই ভালো লাগছে। কোথাও হলদে রঙের বুনো ফুল ফুটে আছে; কোথাও বা পুকুরের জলে শালুক ফুল ভাসছে, পদ্মের মতো দেখতে। সুজয় থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে। কখনো মাকে কখনো বাবাকে কখনো বা দিদিকে দেখিয়ে বলছে, বাঃ দেখো দেখো কি সুন্দর! এক জায়গায় সরু একটা খালের হাঁটুজলে একপাল ছেলে মাছ ধরছে। সুজয় হাততালি দিয়ে বলে উঠল, দিদি ওই দেখো — 'সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে, আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে।' ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে সেও ওদের সঙ্গে মাছ ধরতে লেগে যায়।

ওর আনন্দ দেখে ওর বাবার মনেও খুব আনন্দ হয়েছে। বললেন, কেমন, বলেছিলাম তো কলকাতায় বসে বোঝাই যায় না আমাদের এই দেশ কত সুন্দর আর কত বিরাট্। এই তো মোটে কলকাতা থেকে আশি কিলোমিটার দূরে যাচ্ছ তোমার গ্রামের বাড়িতে — বর্ধমান জেলার ছোট্ট একটি গ্রামে। জান, এমন প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রাম আছে সমস্ত ভারতবর্ষে। আর এই যে তোমার বর্ধমান জেলা এরকম গোটা কয়েক জেলা মিলে বাংলাদেশ। আবার বাংলাদেশের মতো বেশ কয়েকটি দেশ মিলে তবে আমাদের ভারতবর্ষ। দেশ না বলে মহাদেশ বললেও চলে — এতই বিরাট এই দেশ। পঞ্চাশ বা একশো কিলোমিটারের ব্যাপার নয়, বেশ কয়েক-হাজার কিলোমিটার ঘুরে দেখলে তবে সমস্ত ভারতবর্ষকে চেনা যায়। বড়ো হয়ে, গোটা ভারতবর্ষ তুমি ঘুরে দেখবে। তখন বুঝবে এমন সুন্দর দেশ পৃথিবীতে কমই আছে। কত পাহাড়, কত বন, কত নদী, কত শহর, আর সবচাইতে বড়ো কথা, কত-রকমের মানুষ। যতই দেখবে ততই দেশকে আর দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখবে।

কিন্তু সুজয়ের আনন্দ ওখানেই শেষ হয় নি। এর চাইতেও মজার ব্যাপার ঘটল বাড়ি পৌঁছবার পর। বাড়িতে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, অনেকেই তার সমবয়সী, কেউ দু-এক বছরের বড়ো, কেউ ছোটো। এরা কেউ তার জ্যেঠামশায়ের ছেলে-মেয়ে, কেউ বা কাকার। এ ছাড়া কেউ এসেছে তার পিসির বাড়ি থেকে, কেউ মামার বাড়ি, মাসির বাড়ি থেকে। এরা সকলেই তার আপনার জন; তার ভাইবোন। খুড়তুতো, জেঠতুতো, মামাতো, পিসতুতো, মাসতুতো ভাইবোন। এদের আগে কখনো দেখে নি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সকলের সঙ্গে খুব ভাব জমে গেল। সে ভাবে আর অবাক হয়ে যায়। এরা তার এমন আপনার জন, এদের সে চিনতই না। মোটে তো আট-দশ দিন একসঙ্গে কাটিয়েছিল। বিয়ে চুকে যাবার পরে যখন সবাই যে যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, তখন সুজয় কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

বাবা বলছিলেন, এই তো মজা, দেখলে তো, আগে দেখ নি চেন নি বলে আপনজনও তোমার কাছে পর হয়ে ছিল। এখন থেকে এরা তোমার সত্যিকারের আত্মীয় হল। এবার ভেবে দেখো এত বড়ো দেশের কত মানুষকে তুমি জানও না চেনও না। একবার জানলে আর চিনলে তারাও তোমার আপন হয়ে যাবে। দূরে থাকলেই পর. কাছে এলে সবাই আপন। এই তো দেখো না, কলকাতায় আমাদের পাড়ায় স্বামীনাথন বলে যে ছেলেটি থাকে, তোমার সঙ্গে রোজ খেলা করে, তার বাড়ি তো মাদ্রাজে। কিন্তু সে কি তোমার পর? তাকে জান বলেই সে তোমার আপনজন হয়েছে। তোমার এই জেঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনদের চাইতে সে কম আপন নয়। ও একদিন খেলতে না এলে তোমার মন খারাপ হয়ে যায়। তা হলে ভেবে দেখো এমন কত ছেলে-মেয়েকে জান না বলেই তারা পর হয়ে আছে। বাংলাদেশেরই পাশে আসামে, বিহারে, ওড়িশায়, দূরে পাঞ্জাবে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে কত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয় নি। অনেক সত্যিকারের ভাইবোন তোমার হিসেব থেকে বাদ পড়ে আছে। অবশ্য যদি তোমার ইচ্ছা থাকে তবে এই ঘাটতি তুমি পূরণ করে নিতে পার। বড়ো হয়ে ভারতবর্ষের সব রাজ্য তুমি ঘুরে দেখবে। তখন বুঝবে সারা ভারতবর্ষে তোমার কত ভাইবোন, আপনজন ছড়িয়ে আছে। দেশময় মস্ত বড়ো একটা পরিবার। এক পরিবারের মধ্যেই কতরকমের মানুষ থাকে। তুমি খাচ্ছ ভাত, আর একজন খাচ্ছে রুটি, কেউ মাছ-মাংস, কেউ নিরামিষ। আর ওই-যে তোমার দিদিটি, মাসিমার মেয়ে, তার পোশাকটা লক্ষ্য করেছ? ওরা দিল্লিতে থাকে, পাঞ্জাবী মেয়েদের মতো ও মাঝে মাঝে সালোয়ার কামিজ পরে। তোমার যে মামাতো ভাই কানপুরে থাকে সে তো বাংলার চাইতে হিন্দি বলে ভালো। এখন ভেবে দেখো, তোমার আপনজনের মধ্যে যা দেখছ, ভারতবর্ষ-জোড়া আমাদের যে বিরাট্ পরিবার তাতেও ঠিক তাই দেখবে, কতরকমের পোশাক, কতরকমের খাদ্য, কতরকমের ভাষা, কতরকমের ধর্ম; কিন্তু সবাই মিলে এক পরিবার। আমরা সকলে এক পরিবারের মানুষ। আমাদের একটিমাত্র পরিচয়, আমরা ভারতবাসী।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার শেখো
জন্মাবধি; উপলক্ষে; বিরাট্; চুকে; আপনজন; ঘাটতি; পরিবার; সমবয়সী।

২। ভারতবর্ষকে দেশ না বলে মহাদেশ বললেও চলে। কেন বলো তো?

৩। নীচের শব্দগুলোর অর্থের পার্থক্য শেখো:
ভাব — সকলের সঙ্গে খুব ভাব জমে গেল।
ভাব — 'প্রার্থনা' কবিতাটির মূল ভাব কি?

৪। ভারতবর্ষ জোড়া আমাদের যে বিরাট পরিবার তাতে আমরা কি দেখি?

৫। মাদ্রাজের ছেলে স্বামীনাথন সুজয়ের আপনজন হল কি করে?

৬। 'দূরে থাকলেই পর, কাছে এলে সবাই আপন'— কি করে সবাইকে আপন করা যায়? ভারতের কোন কোন রাজ্যের লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

৭। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেমেয়েদের ছবি, স্ত্রী-পুরুষের ছবি, বাড়িঘরের ছবি সংগ্রহ করতে থাকো। তাতে বিবরণ লিখে রাখবে। এইভাবে এদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ছবির বইখানা সম্পূর্ণ হলে বোঝা যাবে — ''আমরা সকলে এক পরিবারের মানুষ।'

৮। বিভিন্ন রাজ্যের পোশাক পরে স্কুলে একটি অভিনয়ের আয়োজন করো। সম্ভব হলে সেই সেই রাজ্যের ভাষায় বলতে হবে 'নমস্কার। আমার নাম ———। আমার বাড়ি ———।'

বাদলের ধারাপাত

সুকুমার রায়

জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত,
অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত।

আকাশের মুখ ঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধার,
পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধার।

স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়,
নদীনালা ঘোলাজলে ভরে ওঠে ভরসায়।

উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের,
শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্লাবনের।

জলে জলে জলময় দশদিক টলমল,
অবিরাম একই গান, ঢালো জল ঢালো জল।

ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের,
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের।

শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুকধুক,
ধরণীর আশা ভয়, ধরণীর সুখদুখ।



অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো : অফুরান; উন্মাদ; প্লাবন; জর্জর; নিঃঝুম; ধরণী; অবিরাম; বারিধারা।

২। ধারাপাত কাকে বলে? কবিতাটির নাম 'বাদলের ধারাপাত' দেওয়া হয়েছে কেন?

৩। গাছপালা কেমন করে স্নান করে? 'আকাশের মুখ ঢাকা'— এ কথা বলা হয়েছে কেন?

৪। বর্ষার দিনের গান কি?

৫। বর্ষার জলধারায় কি কি ধুয়ে যায়?

৬। অর্থের পার্থক্য শেখো :

(ক) সারা : সমস্ত : চাষীরা সারাদিন মাঠে কাজ করে।
সারা : শেষ : কাজ সারা হলে তারা ঘরে ফেরে।
সাড়া : শব্দ : সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই তার সাড়া পাওয়া যায় নি।

(খ) ধোঁয়া : ধূম : রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উঠছিল।
ধোয়া : কাচা, পরিষ্কার করা : ঘর ধোয়া তার প্রতিদিনকার কাজ।

(গ) ধারাপাত : পাটীগণিত শেখার প্রাথমিক বই : আমি ধারাপাত থেকে নামতা শিখি।
ধারাপাত : বৃষ্টিপাত, জল পড়া : শ্রাবণের ধারাপাতে মাঠঘাট ডুবে যায়।

৭। সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' বইতে এই ধরনের এবং অন্য রকম মজার কবিতা দেখতে পাবে।

আগমনী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



অঞ্জনা-নদীতীরে
চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা
গঞ্জের বাঁয়ে
জীর্ণ ফাটল-ধরা—
এক কোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা
কুঞ্জবিহারী।

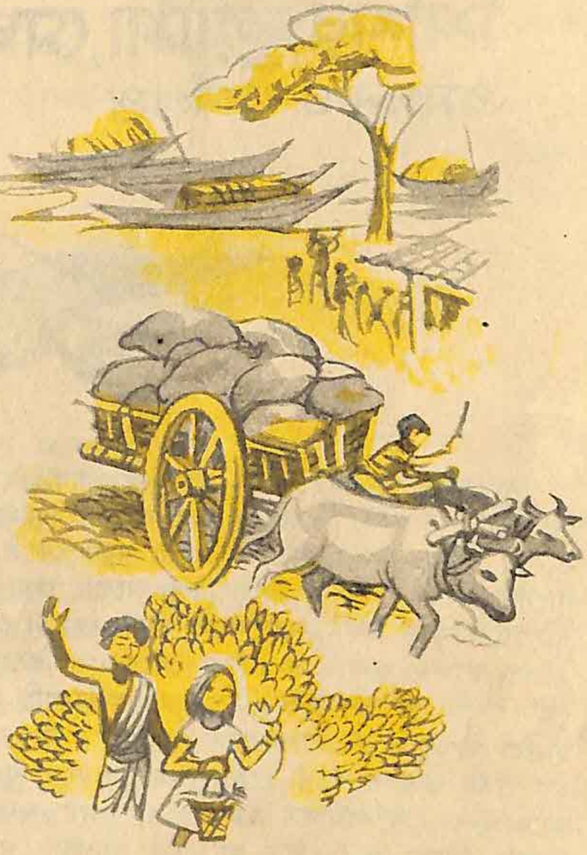
আত্মীয় কেহ নাই
নিকট কি দূর,
আছে এক লেজ-কাটা
ভক্ত কুকুর।
আর আছে একতারা,
বক্ষেতে ধরে
গুন্ গুন্ গান গায়
গুঞ্জন-স্বরে।

গঞ্জের জমিদার
সঞ্জয় সেন
দু-মুঠো অন্ন তারে
দুই বেলা দেন।
সাতকড়ি ভঞ্জের
মস্ত দালান,
কুঞ্জ সেখানে করে
প্রত্যুষে গান।
'হরি হরি' রব ওঠে
অঙ্গন-মাঝে
ঝন্ঝনি ঝন্ঝনি
খঞ্জনি বাজে।

ভঞ্জের পিসি তাই
সন্তোষ পান,
কুঞ্জকে করেছেন
কম্বল দান।
চিঁড়ে গুড়কিতে তার
ভরি দেন ঝুলি
পৌষে খাওয়ান ডেকে
মিঠে পিঠে-পুলি।

আশ্বিনে হাট বসে
ভারি ধুম করে,
মহাজনি নৌকায়
ঘাট যায় ভরে—
হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি,
মহা সোরগোল,—
পশ্চিমি মাল্লারা
বাজায় মাদোল।

বোঝা নিয়ে মন্থর
চলে গোরুগাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন
করে ডাক ছাড়ি।
কল্লোলে কোলাহলে
জাগে এক ধ্বনি
অন্ধের কণ্ঠের
গান আগমনী।
সেই গান মিলে যায়
দূর হতে দূরে
শরতের আকাশেতে
সোনা রোদ্দুরে।



অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :
জীর্ণ; গঞ্জ; গুঞ্জনস্বরে; অঙ্গন; সন্তোষ; সোরগোল; মাল্লা; মন্থর; ক্রন্দন।

২। নীচের শব্দগুলো বাক্যে প্রয়োগ করো :
ফাটল-ধরা, গুন্‌গুন্‌, পিঠেপুলি, কোলাহল, হাঁকাহাঁকি।

৩। ধরা-শব্দযোগে আরো কয়েকটি শব্দ বলো। যেমন, ঘুণ-ধরা।

৪। অন্ধ কুঞ্জবিহারী কোথায় বাসা নিয়েছে? তার আপন বলতে কি কি আছে?

৫। কুঞ্জ প্রতিদিন সকালে কোথায় গান করে? সেখানে সে কি কি পায়? ভজ্জের পিসি কুঞ্জকে কেন কম্বল দান করেছিলেন?

৬। আশ্বিনে যখন হাট বসে তখন ঘাটের অবস্থা কেমন হয় তার বিবরণ দাও।

৭। 'আগমনী' গান কি? সে-গান শরৎকালে গাওয়া হচ্ছিল কেন?

৮। কবিতাটি মুখস্থ করে আবৃত্তি করো।

৯। এই কবিতায় যে ছবি ফুটে উঠেছে তা মনে রেখে গোরুর গাড়ি ও মহাজনি নৌকার ছবি আঁকো।

তাপ

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য



একটা পিতলের ডাণ্ডার একদিক উনানের মধ্যে আছে। দেখবে অপর দিকটা বেশ তেতে গিয়েছে, হাত দিয়ে ধরা যায় না। ডাণ্ডাটা যদি লোহার হয় তবে অপর দিকটা গরম হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু ধরা যায়। কিন্তু একটা কাঠের একদিক জ্বলতে থাকলেও অপর দিকে হাত দিয়ে বেশ ধরা যায়, গরম বোধই হয় না। এ-সব থেকে জানা যাচ্ছে পিতলের মধ্য দিয়ে তাপ বেশি পরিমাণে চলে, লোহার মধ্যে দিয়ে কতকটা যায়, কাঠের মধ্য দিয়ে যায় না বললেই হয়।

পশম, ফ্লানেল প্রভৃতি জিনিস তাপ চলায় খুব বেশি বাধা দেয়। খুব গরমের দিন ছাড়া অন্য সময়ে আমাদের দেশে বাহিরের চেয়ে আমাদের শরীর অপেক্ষাকৃত বেশি গরম থাকে।

শীতের দিনের কথা ধরা যাক। তাপ সব সময় গরম জায়গা থেকে ঠাণ্ডা জায়গায় চলে যায়। শীতের দিনে আমাদের শরীর থেকে তাপ চলে যেতে চায়, তাকে আটকাতে পারলে আমরা শীতের হাত থেকে বেঁচে যাব। তাই শীতের দিনে আমরা পশম, ফ্লানেলের তৈরি জামা ও গায়ের কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে রাখি, শরীর থেকে তাপ বেশি চলে যেতে পারে না। পাখি, জন্তু-জানোয়ারের পালক, লোম বাইরের কনকনে ঠাণ্ডা থেকে তাদের রক্ষা করে।

কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপ কি করে যায়— তা দেখা গেল। কিন্তু তরল পদার্থের মধ্যে তাপ চলাচল ব্যাপারটা বড়ো মজার। আচ্ছা, জলটা কি রকম মনে হয়? জলের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে যায় না, যদি না যায় তবে জলসুদ্ধ হাঁড়ি উনানে বসালে সমস্ত জল গরম হয় কি করে? ব্যাপারটা হল এই। উনান থেকে তাপ পেয়ে হাঁড়ির তলার জল গরম হল। এখন কোনো জিনিস গরম হলে সেটা অপেক্ষাকৃত হালকা হয়ে পড়ে। কাজেকাজেই নীচের গরম জল উপরের ঠাণ্ডা জলের চেয়ে হালকা হল, আর হালকা হওয়ার ফলে উপরে উঠল, উপরের ঠাণ্ডা জল নীচে নামল। এইবার যে জল নীচে এল তার গরম হওয়ার পালা। এ যেই উপরের জলের চেয়ে গরম হল, তখন এও উপরে উঠল। এইরকমে সমস্ত জলটার মধ্যে ওঠানামা চলতে থাকল, সমস্ত জলটা গরম হল।

কিন্তু সূর্য থেকে তাপ আসছে কি করে? সূর্য কত দূরে রয়েছে। আমাদের ও সূর্যের মাঝখানে কঠিন বা তরল পদার্থ কিছুই নেই; বায়ুও কিছুদূর অবধি গিয়ে শেষ হয়েছে। কিভাবে সূর্য থেকে তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে? ঠিক আলো যেভাবে আসছে সেইরকম করে। সূর্য থেকে বিভিন্নরকমের ঢেউ ভীষণ বেগে চারি দিকে ছুটছে। কিছু কিছু আমাদের এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে। এক রকমের ঢেউ আমাদের চোখে পড়লে আলো বলে মনে হয়, অন্যরকমের ঢেউ আমাদের গায়ে পড়লে তাপ বলে বোধ হয়।





জল থেকে বাষ্প উঠছে, বাষ্প যখন ওঠে তখন খানিকটা তাপও চলে যায়, ফলে জল ও তার চারধার ঠাণ্ডা হয়। হাওয়ায় বাষ্প তাড়াতাড়ি ওঠে। শরীর ঘামছে, তখন যদি বাতাস খাওয়া যায়, শরীর বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। হাতে এক ফোঁটা স্পিরিট ঢেলে সেখানে ফুঁ দিলে জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা লাগে। গরম দুধ তাড়াতাড়ি জুড়োতে গেলে আমরা তার উপর হাওয়া করি। পিতলের কলসির জলের চেয়ে কুঁজোর জল বেশি ঠাণ্ডা হয়, কারণ কুঁজোর উপরটা ভেজা থাকে আর সেখান থেকে বাষ্প উঠতে থাকে। এই কুঁজো হাওয়াতে রাখলে জল আরো চটপট ঠাণ্ডা হয়। এ-সব ব্যাপারে আর-একটা কথা আছে। যদি বাইরের বায়ু খুব শুকনো থাকে তবে তাড়াতাড়ি বাষ্প ওঠে, বাইরের বায়ু ভেজা থাকলে সেরকম বাষ্প হয় না। এই কারণে দেখা যায় বর্ষাকালে কাপড় শুকোতে দেরি হয়।

ভোরে গাছের পাতায় পাতায়, ঘাসের ডগায় ছোটো ছোটো জলের ফোঁটা দেখা যায়। এদের আমরা শিশির বলি। এদের উৎপত্তি হয় এইরকমে। দিনের বেলায় নদ-নদী, খালবিল, পুকুর থেকে বাষ্প উঠে বায়ুর সঙ্গে মিশে গেল। রাত্রে গাছপালা, আশ-পাশের বায়ু ঠাণ্ডা থাকল। ওই ঠাণ্ডায় বায়ু অতটা বাষ্প ধরে রাখতে পারল না, কিছুটা জলবিন্দুতে পরিণত হল। পরিমাণে বেশি হয়ে যখন বড়ো বড়ো ফোঁটায় দাঁড়াল, তখন সেই-সব জলের ফোঁটা টপ্‌টপ্ করে পড়তে থাকল। মেঘলা দিনে যে বেশি শিশির পড়ে না তার কারণ এই। মেঘ পৃথিবীর উপর কম্বলের ন্যায় কাজ করে। পৃথিবী বেশি তাপ হারায় না, বায়ু গরম হয়েই থাকে, সুতরাং বাষ্প বায়ুর আকারেই থেকে যায়।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও ব্যবহার শেখো :
অপেক্ষাকৃত ; কন্‌কনে ; কঠিন ; চটপট ; বাধা।

২। নীচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখো :
তরল, গরম, নীচে, হালকা।

৩। পিতল, লোহা ও কাঠ— এর মধ্যে কোন পদার্থটির ভিতর দিয়ে বেশি তাপ যায়?

৪। শীতকালে পশম বা ফ্লানেলের জামা পরলে গরম বোধ হয় কেন?

৫। জলসুদ্ধ হাঁড়ি উনানে বসালে সমস্ত জল গরম হয় কি করে?

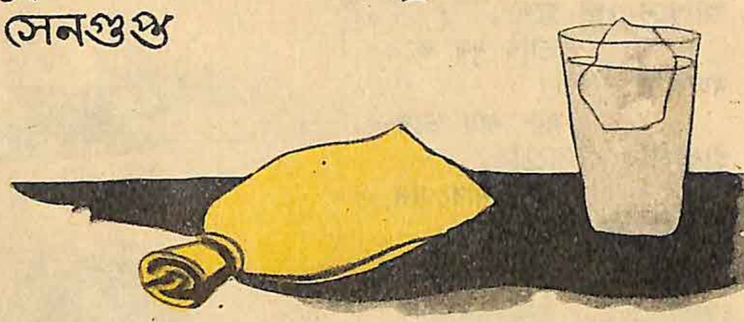
৬। পিতলের কলসির জল আর কুঁজোর জল— কোনটি বেশি ঠাণ্ডা হবে? কেন বলো তো?

৭। বর্ষাকালে ভিজে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকাবে, না শীতকালে? কেন?

৮। মেঘলা দিনে বেশি শিশির পড়ে না কেন?

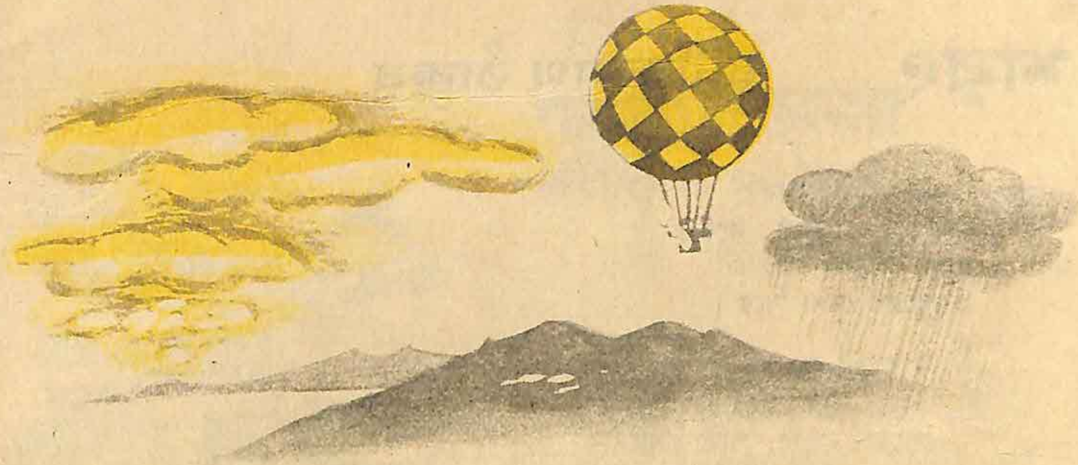
শিশির, কুয়াশা, মেঘ ও বৃষ্টি

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত



সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, পুকুর— এ-সব থেকে জল সব সময় বাষ্প হয়ে হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে। হাওয়ার ভিতর যে জলের বাষ্প রয়েছে তা সহজেই দেখানো যায়। একটি কাচের গ্লাসের মধ্যে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে দিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে, ওই গ্লাসের বাইরের দিকে বিন্দু বিন্দু জলের কণা জড়ো হয়েছে। শুকনো কাপড় দিয়ে গ্লাসটাকে মুছে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আবার ছোটো ছোটো জলের কণা এসে সেখানে জমা হয়। এ-সব জলের কণা এল কোথা থেকে। ভিতরে বরফ থাকায় গ্লাসটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়। গ্লাসের চার দিক ঘিরে তার কাছাকাছি যে হাওয়া আছে গ্লাসের গায়ে লেগে সেই হাওয়া তখন ঠাণ্ডা হতে থাকে। আস্তে আস্তে গ্লাসটা যখন একটা বিশেষ মাত্রায় ঠাণ্ডা হয় তখন তার সংস্পর্শে এসে হাওয়ার জলীয় বাষ্প আর বাষ্প আকারে থাকতে পারে না, জমে জলকণায় পরিণত হয়। এইজন্যই আইসব্যাগে বরফ পুরে দিলে তার বাইরের দিকটা ভিজে ওঠে, মনে হয় যেন ব্যাগটার গায়ে ফুটো আছে, ভিতরের বরফজল ওই ফুটো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ব্যাগে বরফ বা খুব ঠাণ্ডা জল না থাকলে তার বাইরে কিন্তু কোনো জল জমতে দেখা যায় না। এর থেকেই বোঝা গেল, হাওয়ায় জলের বাষ্প মিশে আছে। এই জলীয় বাষ্প একেবারে স্বচ্ছ, তাই চোখে দেখতে পাই না।

শীতের রাতে ঘাসের উপর, গাছের পাতায়, আমরা শিশির জমতে দেখি। দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপে মাটি গরম হয়, সূর্য অস্ত গেলে তাপ ছেড়ে দিয়ে ওই মাটি ঠাণ্ডা হতে থাকে। শীতকালে শেষরাত্রির দিকে ওই মাটি এতটা ঠাণ্ডা হয় যে, তার সংস্পর্শে এসে জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে জলের কণার আকারে জমা হতে থাকে ঘাসে ও গাছের পাতায়। এই জলকণাকেই আমরা বলি শিশির। মাটির উপরেও শিশির পড়ে, মাটি ওই জল শুষে নেয় বলে তা আর আমরা দেখতে পাই না। কখনো কখনো হাওয়ার ভিতরকার জলীয় বাষ্প খুব ছোটো ছোটো জলের কণায় জমে গিয়ে মাটির কাছে হাওয়ার উপর ভেসে বেড়ায়। একেই বলি কুয়াশা, খুব নিচু মেঘও একে বলা যায়। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে পৃথিবী সূর্যের উত্তাপ পায় অনেক বেশি, তাই রাত্রিতে মাটি এতটা ঠাণ্ডা হয় না যাতে তার গায়ে ঠেকে জলের বাষ্প জমে জল হতে পারে। এইজন্যই গ্রীষ্মকালে শিশির পড়ে না। আয়নার উপর আলো পড়লে সেই আলো যেমন ফিরে আসে, মেঘের গায়ে ঠেকে তাপও তেমনি ফিরে আসে। রাত্রিতে মাটি তাপ ছেড়ে দেয়, উপরে উঠতে গিয়ে ওই তাপ মেঘের গায়ে বাধা পেয়ে আবার মাটিতেই ফিরে আসে। মেঘলা দিনে তাই গরম বোধ করি। মাটি যতটা ঠাণ্ডা হলে তাতে শিশির জমতে পারে, আকাশে মেঘ থাকলে ততটা ঠাণ্ডা হয় না, তাই শিশিরও পড়ে না।



শুকনো হাওয়ার চেয়ে জলের বাষ্প অনেক হালকা, তাই জল বাষ্প হলে সেই বাষ্প ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে যায়। মাটি থেকে যতই উপরে উঠে যায় হাওয়া ততই ঠাণ্ডা হতে থাকে; বেলুনে ও এরোপ্লেনে চড়ে যাঁরা অনেক উঁচুতে উঠেছেন তাদের কাছ থেকে এ-খবর আমরা জেনেছি। জলের বাষ্প উঠলে ঠাণ্ডা হতে থাকে, তার পর এমন একটা সময় আসে যখন ওই ঠাণ্ডায় বাষ্প জমে ছোটো ছোটো জলের কণা হয়ে হাওয়ার উপর ভেসে বেড়ায়। এইভাবে অসংখ্য জলের বিন্দু সৃষ্টি হয়ে হাওয়াতে ভাসতে থাকে। এই ভাসন্ত জলের কণাগুলিকে আমরা বলি মেঘ। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে এই মেঘের গায়ে লাগলে অনেকগুলি জলের কণা একত্র হয়ে বড়ো বড়ো জলের ফোঁটায় পরিণত হয়। এই ফোঁটাগুলি তখন এত ভারী হয় যে হাওয়াতে ভেসে থাকতে পারে না, পৃথিবীর টানে নেমে আসে মাটির উপর। আমরা বলি, বৃষ্টি হচ্ছে। যে জল মাটির উপর থাকে, বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে গিয়ে সেখানকার ঠাণ্ডায় জমে সে জল আবার মাটিতেই ফিরে আসে।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর বানান ও ব্যবহার শেখো:
সমুদ্র, ঠাণ্ডা, এরোপ্লেন, ভাসন্ত।

২। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো:
মাত্রা; স্বচ্ছ; সংস্পর্শ; ক্রমাগত; অসংখ্য; সৃষ্টি; একত্র; তাপ; বিন্দু বিন্দু।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করো:
—— উপর আলো পড়লে সেই আলো যেমন —— আসে, —— গায়ে ঠেকে —— তেমনি —— আসে।

৪। হাওয়ায় যে জলের বাষ্প রয়েছে তা কিভাবে দেখানো যায়?

৫। শীতকালে ঘাসের উপর শিশির জমে কেন? মাটিতে ওই শিশির দেখা যায় না কেন?

৬। কুয়াশা কাকে বলে? শীতকালে কুয়াশা দেখা যায় অথচ গ্রীষ্মকালে দেখা যায় না— এর কারণ কি?

৭। মেঘলা দিনে বেশি গরমবোধ হয় কেন?

৮। আকাশে মেঘ কেমন করে জমে? মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় কখন?

৯। স্কুলে আবহাওয়া চার্ট তৈরি করো। তাতে তারিখ দিয়ে কোন দিন শিশির, কুয়াশা ও মেঘ দেখা যায় এবং কোন দিন বৃষ্টি হয়, তা লিখে রাখো। এগুলি দেখানোর জন্য রঙ দিয়ে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে শেখো।

শরৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার 'পরে।
সকাল বেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।

আমলকী-বন কাঁপে যেন তার
বুক করে দুরু দুরু।
পেয়েছে খবর, পাতা-খসানোর
সময় হয়েছে শুরু।

শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এল,
টগর ফুটিল মেলা।
মালতী-লতায় খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছি দুই বেলা।

গগনে গগনে বরষণ-শেষে
মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া।
বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে,
নাই কোনো কাজে তাড়া।

দিঘি-ভরা জল করে ঢল-ঢল,
নানা ফুল ধারে ধারে।
কচি ধান-গাছে খেত ভরে আছে,
হাওয়া দোলা দেয় তারে।

যেদিকে তাকাই সোনার আলোয়
দেখি যে ছুটির ছবি।
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই
পূজার দিনের রবি।



অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :
পরশ; বরষণ; রবি; হিমের; রেখা।

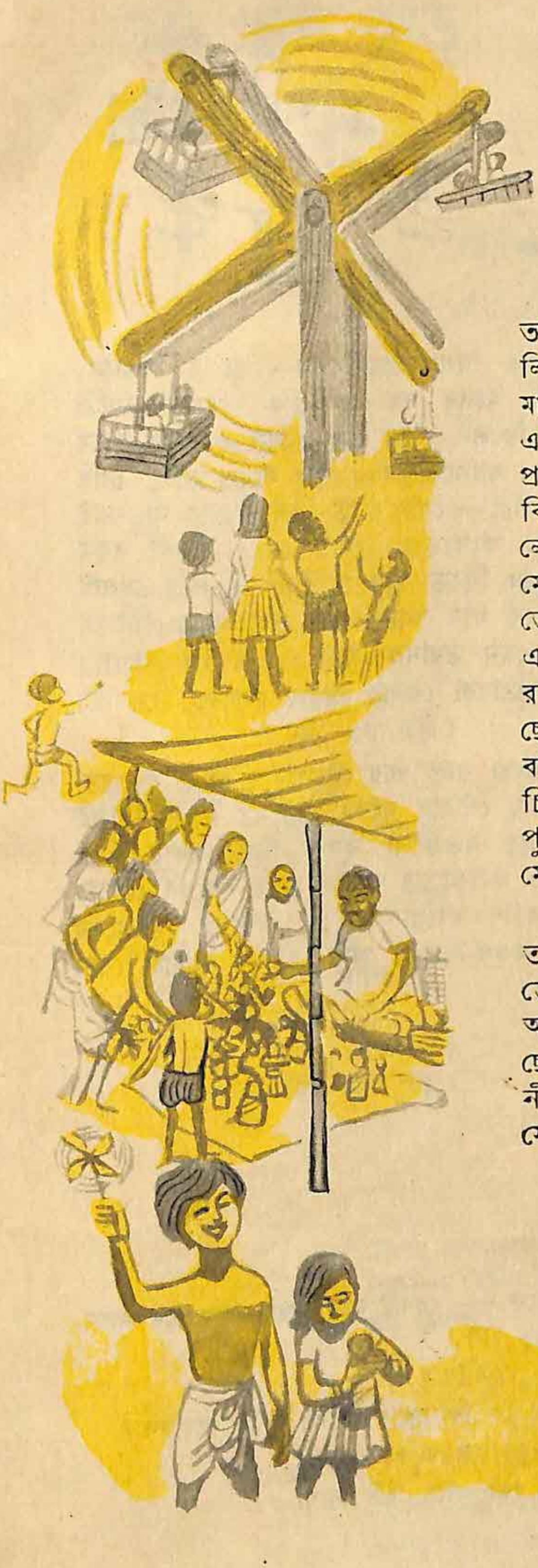
২। 'আমলকী-বন কাঁপে যেন তার
বুক করে দুরু দুরু।'
আমলকী-বন কাঁপে কিভাবে? তার বুক দুরু দুরু করে কেন? শীতকালে আর কোন্ কোন্ গাছের পাতা খসে পড়ে লক্ষ্য করে তাদের নাম শেখো।

৩। মেঘেদের কোনো কাজে তাড়া নেই কেন?

৪। কবি-দিবসে বা অন্য উৎসব-অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করার জন্য কবিতাটি মুখস্থ করো।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি'—গানটি শেখো।

মেলার মজা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



তুমি ভাবছ, মজা কেবল তোমাদেরই হয়েছে তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েছ, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পারছ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি করেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল? —পঞ্চাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্ততঃ দশ হাজার লোক তো হয়েইছিল। তুমি লিখেছ, একটি ছোটো মেয়ে, তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চিৎকার করে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিল। আমাদের এখানকার মাঠে যা-চিৎকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল, তার কি সংখ্যা ছিল। ছোটো ছেলের কান্না, বড়োদের হাঁকডাক, ডুগডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ, যাত্রার দলের চিৎকার, তুবড়িবাজির সোঁ-সোঁ, পটকার ফুটফাট, পুলিস-চৌকিদারের হৈ-হৈ, হাসি, কান্না, গান, চেঁচামেচি, ঝগড়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।

৭ই পৌষে মাঠে খুব বড়ো হাট বসেছিল। তাতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে-ভাজা ফুলুরি, চিনেবাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস বিক্রি হল। এক-এক পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব নাগরদোলায় দুলল; চাঁদোয়ার নীচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল— সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়।





তারপরে ৯ই পৌষ আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা করেছিলেন— তাতে সিঙাড়া, আলুর-দমের দোকান বসিয়েছিলেন— এক-একটা আলুর দম এক-এক পয়সায় বিক্রি হল। সুকেশী বউমা চিনে-বাদামের পুতুল গড়েছিলেন, তার এক-একটা ছ-আনা দামে বিক্রি হয়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল— তার খড়ের চাল, চারি দিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে— সেটা কেউ কিনতে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর করে তিন টাকায় বিক্রি করেছে। ভেবে দেখো— কী রকম ভয়ানক মজা। ছোটো মেয়েরা একটুকরো নেকড়া ছিঁড়ে তার চারি দিকে পাড় সেলাই করে আমার কাছে এনে বলল, 'এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে'— বলে সেটা আমার পকেটে পুরে দিল— এমন ভয়ানক মজা। ওঁদের বাজারে এইরকম শ্রেণীর সব ভয়ানক মজা হয়ে গেছে— তোমরা যে-সব প্রাইজ পেয়েছ, সে এর কাছে কোথায় লাগে।

তার পর মজা— মেলা যখন ভেঙে গেল, সমস্ত রাত ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক ঠিক আমার শোবার ঘরের সামনের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগল— মজায় একটুও ঘুম হল না— নীচে যতগুলো কুকুর ছিল, সবাই মিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে চেঁচাতে লাগল, এমন মজা। তার পরে কলকাতার অনেক মেয়ে তাঁদের ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন— তাঁদের কারো কাশি কারো জ্বর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম, গোলমাল, কাশি-সর্দি, অসুখ-বিসুখ, আট আনায় রুমাল বেচা প্রভৃতি হয় নি— অতএব আমারই জিত রইল।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর বানান ও অর্থ শেখো :
ফর্দ, আঙিনা, চৌকিদার, চাঁদোয়া, ঊর্ধ্বশ্বাসে।

২। নীচের শব্দগুলোর বাক্যে প্রয়োগ করো
সংখ্যা, নাগরদোলা, অন্ততঃ, ঠেলাঠেলি, ধুমধাম।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করো :
ছোটো —— একটুকরো —— ছিঁড়ে তার চারি দিকে —— সেলাই করে আমার কাছে এনে বললে, 'এটা ——, এর দাম আট আনা, আপনাকে —— হবে।'

৪। ৭ই পৌষের মেলায় কি কি আশ্চর্য জিনিস বিক্রি হয়েছিল ?

৫। ৯ই পৌষ কারা মেলা বসিয়েছিল ? সেই মেলায় কি কি মজার জিনিস বিক্রি হয়েছিল ?

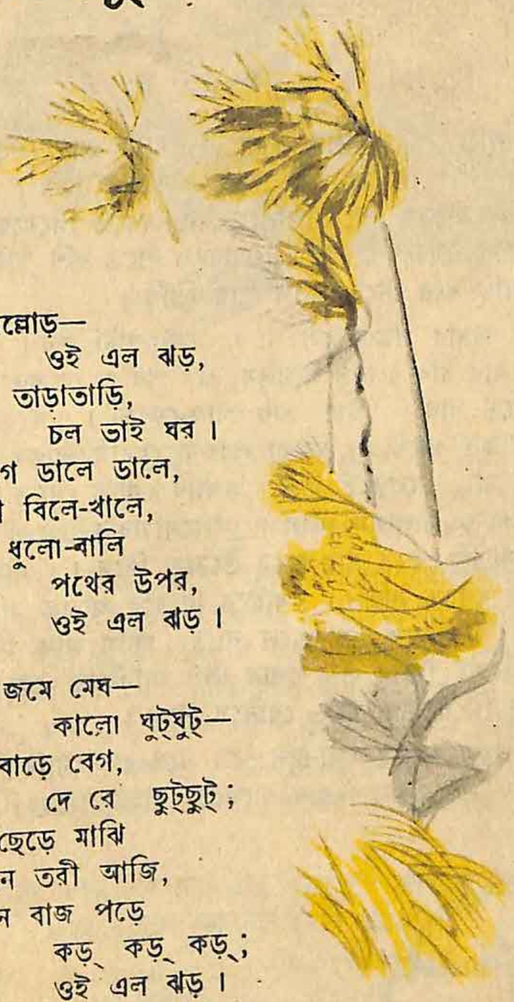
৬। 'মজায় একটুও ঘুম হল না'— কি ধরণের মজায় ঘুম হল না ?

৭। তোমার দেখা একটি মেলার বিবরণ দিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে চিঠি লেখো।

৮। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে মেলা বসে কেন ?

ওই এল ঝড়

সুনির্মল বসু



শালবনে হুল্লোড়—
ওই এল ঝড়,
মাঠ ছেড়ে তাড়াতাড়ি,
চল ভাই ঘর।
দোলা লাগে ডালে ডালে,
ঢেউ জাগে বিলে-খালে,
উড়ে যায় ধুলো-বালি
পথের উপর,
ওই এল ঝড়।

আশমানে জমে মেঘ—
কালো ঘুটঘুট্—
তুফানের বাড়ে বেগ,
দে রে ছুটছুট্;
মাঝ-নদী ছেড়ে মাঝি
কূলে আনে তরী আজি,
কোথা যেন বাজ পড়ে
কড়্ কড়্ কড়্;
ওই এল ঝড়।

আম বাগানেতে গিয়ে
কাজ নাই আজ,
ডরে বুক কাঁপে শুনে
ঝড়ের আওয়াজ;
তালবনে খালি খালি
দেয় কে রে করতালি,
খেজুর পাতায় বাজে
হাজার ঝাঁজর—
ওই এল ঝড়।

ঝোড়ো-কাকে দেয় ডাক—
উড়ে যায় চিল,
ফাঁকা সে আকাশে নাই
ফাঁক একতিল।
বাগানের ফুলগুলি
ঝরে যায় বিলকুলি,
নীড়-হারা বুলবুলি
কাঁপে থর থর—
ওই এল ঝড়।

ঘরে বসে চুপচাপ
থাক না-এখন,
চুপ করে বসে দেখ
ঝড়ের মাতন—
ওপারে গ্রামের 'পরে
আকুল বাদল ঝরে,
জলছবি ভেসে ওঠে
অতি মনোহর—
ওই এল ঝড়।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :
আশমান; তরী; নীড়; মাতন; মনোহর; তুফান; ঝাঁজর।

২। ঝড় উঠলে—
(ক) মাঝি কি করে?
(খ) তালবনে কেমন আওয়াজ হয়?
(গ) বুলবুলির কি দশা হয়?
(ঘ) ওপারে গ্রাম কেমন দেখায়?

৩। তোমার দেখা একটি ঝড়ের বিবরণ লেখো।

৪। আবৃত্তি করার জন্য কবিতাটি মুখস্থ করো।

আবদুল মাঝির গল্প
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ, আর কচ্ছপের ডিম। সে আমার কাছে গল্প করেছিল একদিন— চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কাল-বৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকো ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি।

গল্পটা এত শিগ্‌গির শেষ হল আমার পছন্দ হল না। নৌকোটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্‌পই নয়। বার বার বলতে লাগলুম, তার পর? সে বললে, তার পর সে এক কাণ্ড। দেখি এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফ-জোড়া। ঝড়ের সময়ে সে উঠেছিল ওপারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে। খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়াল আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল টক্‌টকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনা-শোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম, আও বাচ্ছা! সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্যে যতই ছট্‌ফট্ করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, আবদুল, সে মরে গেল নাকি? আবদুল বললে, মরবে তার বাপের সাধ্যি কি? নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে





তো ? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।

আমি বললুম, আচ্ছা, বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমির ? আবদুল বললে, জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয়, ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাঁখারি চাঁচছে, তার ছাগল-ছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাং ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ওই দানো-গিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগাল। ছাগল-ছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, তার পরে ? আবদুল বললে, তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো এবং বাক্যে প্রয়োগ করো :
তুফান; দমকা-হাওয়া; ব্যস্ত; ডিঙি; বিচ্ছিরি; দানো-গিরগিটি।

২। নীচের শব্দগুলোর বিশেষ অর্থ ও প্রয়োগ শেখো :
ডোবে ডোবে; ধরে ধরে; মরে মরে; পড়ে পড়ে।

৩। আবদুল মাঝি দাদাকে কি কি জিনিস এনে দিত ? আবদুল মাঝি তো জেলে নয়, তবু সে ও-সব জিনিস কোথায় পেত ?

৪। আবদুল মাঝি কেমনভাবে নেকড়ে বাঘকে জব্দ করেছিল, লেখো।

৫। কাঁচি বেদেনি কিভাবে কুমিরের মুখ থেকে ছাগল ছানা রক্ষা করেছিল, লেখো।

৬। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইখানা পড়ো।

পথহারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকে আমি কত দূর যে
গিয়েছিলেম চলে।
যত তুমি ভাবতে পার
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা
তোমায় বলে বলে।

অনেক দূর সে, আরো দূর সে
আরো অনেক দূর।
মাঝখানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ, কত যে খেত,
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুরবাড়ি
ছাড়িয়ে তালিমপুর।

পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে
সাত-কুশি সব গ্রাম,
ধানের গোলা গুনব কত
জোদ্দারদের গোলার মতো,
সেখানে যে মোড়ল কারা
জানি নে তার নাম

একে একে মাঠ পেরোলুম
কত মাঠের পরে।
তার পরে, উঃ, বলি মা, শোন,
সামনে এল প্রকাণ্ড বন,
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
গা ছম-ছম করে।

জামতলাতে বুড়ী ছিল,
বললে "খবরদার!"
আমি বললেম বারণ শুনে
"ছ-পণ কড়ি এই নে গুনে,"
যতক্ষণ সে গুনতে থাকে
হয়ে গেলাম পার।

কিছুরি শেষ নেই কোথাও
আকাশ পাতাল জুড়ি'।
যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো মুখোশপরা আঁধার
সাজল জুজুবুড়ী।

খেজুরগাছের মাথায় বসে
দেখছে কারা ঝুঁকি।
কারা যে সব ঝোপের পাশে
একটুখানি মুচকে হাসে,
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো
কেবল মারে উঁকি।

আমায় যেন চোখ টিপছে
বুড়ো গাছের গুঁড়ি।
লম্বা লম্বা কাদের পা যে
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে,
মনে হচ্ছে পিঠে আমার
কে দিল সুড়সুড়ি।

ফিসফিসিয়ে কইছে কথা
দেখতে না পাই কে সে।
অন্ধকারে দুদ্দাড়িয়ে
কে যে কারে যায় তাড়িয়ে,
কী জানি কী গা চেটে যায়
হঠাৎ কাছে এসে।





ফুরোয় না পথ ভাবছি আমি
ফিরব কেমন করে।
সামনে দেখি কিসের ছায়া,—
ডেকে বলি, "শেয়াল ভায়া,
মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দে না মোরে।"

কয় না কিছুই, চুপটি করে
কেবল মাথা নাড়ে।
সিঙ্গিমামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন এসে ডেকে
কে জানে, মা, হালুম করে
পড়ল যে কার ঘাড়ে।

বল্ দেখি তুই, কেমন করে
ফিরে পেলেম মাকে ?
কেউ জানে না কেমন করে;
কানে কানে বলব তোরে ?—
যেমনি স্বপন ভেঙে গেল
সিঙ্গিমামার ডাকে।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :
জোদ্দার; প্রকাণ্ড; ফিসফিসিয়ে।

২। নীচের শব্দগুলো বাক্যে প্রয়োগ করো :
ছম-ছম; জুজুবুড়ি; লম্বা লম্বা; সুড়সুড়ি।

৩। অর্থের পার্থক্য দেখাও :
লম্বা — লম্বা লম্বা
বেঁটে — বেঁটে বেঁটে
যেতে — যেতে যেতে
এক — একে একে

৪। উঃ, খবরদার, সাবাস, হায় হায়, আহা, ছি ছি — এই শব্দগুলো একজাতীয়। এখানে যে বাক্যগুলো দেওয়া হল সেগুলোর শূন্যস্থানে কোনটি কোথায় খাটবে বসাও।
——, বাপ-মা-মরা এইটুকু ছেলের কী দুঃখ!
——, সামনে সাপ!
——, খুব ভালো খেলছে!
——, এমন ভালো লোকের এত কষ্ট!
——, ওইটুকু ছেলের গায়ে হাত তুললে! তোমার লজ্জা করে না!

৫। ছোট্ট খোকন স্বপ্নে কোন কোন জায়গা ঘুরে এল? সে-সব জায়গায় সে কী কী আশ্চর্য জিনিস দেখল?

৬। কবিতাটি আবৃত্তি করার জন্য মুখস্থ করো।

গেছো বাবা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



উধো। কী রে, সন্ধান পেলি?

গোবরা। আরে ভাই, তোমার কথা শুনে আজ মাসখানেক ধরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পঞ্চু। কার সন্ধান করছিস রে?

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্চু। গেছো বাবা? সে আবার কে রে?

উধো। জানিস নে? বিশ্বসুদ্ধ লোক তাকে জানে।

পঞ্চু। তা, গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি।

উধো। বাবা যে-গাছে চড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতরু। তলায় দাঁড়িয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পঞ্চু। খবর পেলি কার কাছ থেকে?

উধো। ধোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল; ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছিল, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটেগুড়, তামাক তৈরি করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল টলে— চিটেগুড়ে তার মুখ চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর; বললে, ভেকু, তোর মনের কামনা কী খুলে বল। ভেকুটা বোকা; বললে, বাবা, একখানা ট্যানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খ'সে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকাল তখন আর কারও দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাস, তার পরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

পঞ্চু। হায় রে হায়, শাল নয়, দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর বুদ্ধি কত হবে!

উধো। তা হোক নেপু। ওই গামছা নিয়েই তার দিব্যি চলে যাচ্ছে— দেখিস নি? রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পঞ্চু। কি করে হল। ভেল্‌কি নাকি?

উধো। হোঁদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলুটা মুলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ-বা এসে বলে, ও ভেকুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিন মাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবিদ্যি চাই পাঁচ সিকে, পাঁচটা সুপুরি, পাঁচ কুনকে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পঞ্চু। নৈবিদ্যি তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছু ?

উধো। পাচ্ছে বইকি। গাজন পাল গামছা ভরে পনেরোদিন ধরে ধান ঢেলেছে ; তার পরে ওই গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ওই পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব, ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিদ্ধি ঘোঁটে, তার দাড়ি চুমরিয়ে দেয়।

পঞ্চু। সত্যি বলছিস ?

উধো। সত্যি না তো কী ! গাজন যে আমার মামাতো ভাইয়ের ভায়রা ভাই হয়।

পঞ্চু। আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস ?

উধো। দেখেছি বইকি। হটুগঞ্জের তাঁতে দেড়গজ ওসারের যে গামছা বুনুনি হয়, চাঁপার বরণ জমি, লাল পাড়, এক্কেবারে বেমালুম তাই।

পঞ্চু। বলিস কী ! তা, সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী করে।

উধো। ওই তো মজা। বাবার দয়া !

পঞ্চু। চল্ ভাই, চল্, খোঁজ করতে বেরই। কিন্তু, চিনব কী করে ?

উধো। সেই তো মুশকিল। কেউ তো তাকে দেখে নি। আবার হবি তো হ, ভেকু বেটার চোখ গেল চিটেগুড়ে বুজে।

পঞ্চু। তবে উপায় ?

উধো। আমি তো হাটে ঘাটে যাকে দেখছি তাকেই জোড়হাত করে জিগেস করছি, দয়া করে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা। শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো দিল আমার মাথায় হুঁকোর জল ঢেলে।

গোবরা। তা দিক গে। ছাড়া হবে না। খুঁজে বের করবই। যা থাকে কপালে।

পঞ্চু। ভেকু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নীচে থাকেন চেনবারই জো নেই।

উধো। গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মানুষকে পরখ করব কী করে ভাই ! আমি এক বুদ্ধি করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই বলছি, আমড়া পেড়ে নাও— গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

পঞ্চু। আর দেরি নয় রে, চল্। কপালের জোর যদি থাকে তবে দর্শন লাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে-না ভাই ! গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পারুলবনে কোথাও যদি থাক লুকিয়ে, একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা। ওরে হয়েছে রে, দয়া হল বুঝি।

পঞ্চু। কই রে, কই।

গোবরা। ওই-যে চালতা গাছে।



পঞ্চু। কী রে, চালতা গাছে কী, দেখছি নে তো কিছু!

গোবরা। ওই-যে দুলছে!

পঞ্চু। কী দুলছে। ও তো ল্যাজ রে।

উধো। তোর কেমন বুদ্ধি গোবরা, ও বাবার ল্যাজ নয় রে, হনুমানের ল্যাজ। দেখছিস নে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে?

গোবরা। ঘোর কলি যে! বাবা ঐ কপিরূপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জন্যে।

পঞ্চু। ভুলছি নে, বাবা, কালামুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পার মুখ ভ্যাঙাও, নড়ছি নে—তোমার ওই শ্রীল্যাজের শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে শুরু করল রে।

পঞ্চু। পালাবে কোথায়? আমাদের ভক্তির দৌড়ের স... পারবে কেন?

গোবরা। ওই বসেছে কয়েৎবেল গাছের ডগায়।

উধো। পঞ্চু, উঠে পড়্-না গাছে।

পঞ্চু। আরে, তুই ওঠ্-না।

উধো। আরে তুই ওঠ্।

পঞ্চু। অত উচ্চে উঠতে পারব না, বাবা, কৃপা করে নেমে এসো।

উধো। বাবা, তোমার ওই শ্রীল্যাজ গলায় বেঁধে অন্তিমে যেন চক্ষু মুদতে পারি এই আশীর্বাদ করো।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর বানান ও অর্থ শেখো.
অন্তিমে; কামনা; বন-বাদাড়; নৈবিদ্যি; কল্পতরু; মুদতে পারি; শরণ।

২। কল্পতরু কাকে বলে? ভেকু ডুমুরগাছ থেকে কি পেয়েছিল?

৩। ভেকু তার গামছার সাহায্যে কিভাবে নানা জিনিস লাভ করেছিল?

৪। কাকে গেছো বাবা বলা হয়েছে?

৫। স্কুলের অনুষ্ঠানে 'গেছো বাবা' নাটক অভিনয় করো।

৬। গেছো বাবার গল্প নিয়ে একটি ছবি আঁকো।



রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিদাদা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে খুব ভালোবাসতেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে বয়সের অনেক তফাত। কিন্তু জ্যোতিদাদা ছোটো ভাইটির সঙ্গে ব্যবহার করতেন সমবয়সীর মতো। বন্ধু যেমন করে বন্ধুর সঙ্গে মেশে জ্যোতিদাদা রবির সঙ্গে মিশতেন ঠিক তেমনি করে। লেখায়-পড়ায় গানে-বাজনায় আমোদে-উৎসবে রবি ছিলেন জ্যোতিদাদার সব সময়ের সঙ্গী।

রবীন্দ্রনাথের বাবার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। শিলাইদহে ছিল তাঁর একটি কাছারি-বাড়ি। মহর্ষির ছেলেরা মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াতে যেতেন। একবার জ্যোতিদাদা সেখানে গেলেন ভাইকে নিয়ে। ভাই তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। কিন্তু জ্যোতিদাদা ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষ মনে করতেন না। তিনি এক টাট্টু ঘোড়া কিনে এনে বালক রবিকে বললেন— এই নাও! চড়ো!

শহুরে ছেলে। ঘোড়ার গাড়িতে অনেক চড়েছেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া? সে কি কথার কথা!

জ্যোতিদাদা বললেন— ভাবছ কি? চড়ো! ঘোড়ায় চড়লে শরীর মজবুত হবে! ভয়? ভয় কিসের? এই দেখো-না! —বলেই এক লাফে উঠে টাট্টুটাকে মাইলখানেক টগ্‌বগ্ করে ছুটিয়ে আনলেন নিজেই। রবীন্দ্রনাথের ভয় ভেঙেছিল। তিনিও দাদার মতো ঘোড়সওয়ার হয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জ্যোতিদাদার মস্ত একটা আরবী ঘোড়া ছিল। দাদার দেখাদেখি ভাইটিও কলকাতার পথে এক সময় সে ঘোড়া ছুটিয়েছেন। জ্যোতিদাদা বলতেন— স্বাস্থ্য চাই, শক্তি চাই, সাহস চাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শখ ছিল বাঘ শিকারের। শিলাইদহ থাকতে একবার শোনা গেল জঙ্গলে বাঘ এসেছে। খবর আসতে না আসতেই তিনি বন্দুক বাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভাইকেও সঙ্গে নিলেন। বিপদের কথা একটুও ভাবলেন না। বাঘ শিকারে নয়, যেন বনভোজনে যাচ্ছেন এমনি ভাবখানা।

সঙ্গে ছিল একজন শিকারী, নাম বিশ্বনাথ। বনের মধ্যে একটা মোটা বাঁশগাছের কঞ্চিগুলো কেটে কেটে একটা মইয়ের মতো তৈরি করা হল। দুই ভাই বিশ্বনাথকে নিয়ে তারই উপর উঠলেন। শিকারীরা মাচানের উপর চড়ে বাঘ শিকার করে। কিন্তু জ্যোতিবাবুর খুব সাহস। তিনি মাচানে উঠলেন না, ছোটো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে উঠলেন ওই বাঁশের মইয়ে। বিশ্বনাথও সঙ্গে রইল।

চারি দিক নিস্তব্ধ। কেবল ঝিঁঝি পোকার একটানা ঝন্‌ঝনানি। মইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ যে কাটল তার হিসেব নেই। হঠাৎ বিশ্বনাথ সামনের ঝোপটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে কি যেন ইশারা করল। জ্যোৎস্না পড়েছে মাঠে। তারই আলোয় দেখা গেল বাঘের গায়ের কালো কালো হলদে হলদে দাগ। অমনি জ্যোতিদাদার বন্দুক গুড়ুম করে ডেকে উঠল। গুলি গিয়ে লাগল একেবারে বাঘটার শিরদাঁড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ আরো একবার এই দাদার সঙ্গেই হাতির পিঠে চড়ে বাঘ শিকারে বেরিয়েছিলেন। সেবারেও বাঘ বেরিয়েছিল এবং জ্যোতিদাদাও বন্দুক ছুঁড়েছিলেন কিন্তু শিকারীর গুলি সেবার লক্ষ্যভেদ করতে পারে নি। রোদঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে বাঘটা দিলে ছুট, যেন বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা।

জ্যোতিদাদা পিয়ানো বাজাতেন খুব সুন্দর। তাঁর হাতে ঝমাঝম্ করে সুর বেরোত। আর রবীন্দ্রনাথ সুরে সুরে কথা বসাতেন। এমনি করে তাঁর অনেক গান রচিত হয়েছে।

হারমোনিয়মও তিনি খুব ভালো বাজাতে পারতেন। জ্যোতির বাজনার সঙ্গে রবির গান মহর্ষির বড়ো প্রিয় ছিল।





একবার মাঘোৎসবের জন্যে কবি অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন। মহর্ষি খবর পেয়ে দুই ভাইকে ডেকে পাঠালেন। রবীন্দ্রনাথকে বললেন—নূতন গান যা শিখেছ শোনাও। মহর্ষি বসেছেন আরামকেদারায়, পুত্ররা বসলেন তাঁর পায়ের কাছে। জ্যোতিদাদা নিলেন হারমোনিয়ম, রবীন্দ্রনাথ গান ধরলেন।

একে একে সব কটি গান গাওয়া হল। কোনো কোনো গান দুবারও গাইতে হল।

গান গাওয়া শেষ হলে মহর্ষি বললেন—দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানত তবে কবিকে তো তারা পুরস্কার দিত। বিদেশী রাজার কাছে সে আশা তো নেই। তাই সে-কাজ আমাকেই করতে হবে।

এই বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের হাতে পাঁচ-শ টাকার একটি চেক দিলেন। এই পুরস্কার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব আনন্দিত হয়েছিলেন কিন্তু জ্যোতিদাদার আনন্দ হয়েছিল অনেক বেশি।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :
মহর্ষি; জ্যোৎস্না; বন্দুকওয়ালা; আরাম কেদারা; শিরদাঁড়া; আরবী ঘোড়া।

২। রবীন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়া শিখেছিলেন কিভাবে? তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য জ্যোতিদাদা কি বলতেন?

৩। মনে করো, শিলাইদহের জঙ্গলে জ্যোতিদাদা যখন বাঘ শিকার করেছিলেন তুমিও সঙ্গে ছিলে। নিজের চোখে দেখেছ, এইভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করো।

৪। মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন কেন? তখন তিনি কি বলেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ আর কোনো পুরস্কার পেয়েছিলেন কি?

৫। 'জ্যোতিদাদার আনন্দ হয়েছিল অনেক বেশি।' কি কারণে আনন্দ হয়েছিল? আনন্দ অনেক বেশি হয়েছিল কেন?

৬। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইখানি পড়লে তাঁর বাল্যকালের অনেক কথা জানা যাবে।

৭। এই 'ছেলেবেলা' বইয়েই বিশ্বনাথ শিকারীর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা আছে। সেটি এই লেখার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ো।

দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে

নারায়ণচন্দ্র চন্দ



বড়োদিনের ছুটিতে গৌতম কলকাতায় মামাবাড়ি এসেছে। এ সময়ে শহরে সার্কাস, মেলা ও নানারকম অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সেদিন বিকেলে সে তার ছোটোমামা পুলকের সঙ্গে শহরের জাঁকজমক দেখতে বেরিয়েছে। এক পার্কে প্রদর্শনী হচ্ছিল। তারা সেখানে উপস্থিত হল, পার্কের একদিকে সিনেমার ছবি দেখানো হবে, তার আয়োজন হয়েছে, অন্য দিকে পুতুলনাচ দেখানোর মঞ্চ, সেখানে আসবে দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে।

পুলক গৌতমকে জিজ্ঞেস করল— কি দেখবে, সিনেমার ছবি ?

——না, সিনেমা নয়, চলুন ঐটি দেখি। নানান দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই পরিচয় হোক।

ওরা দুজনে টিকিট কিনে পুতুলনাচ দেখানোর জন্য ঘেরা জায়গার ভিতরে গিয়ে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানটি পূর্ণ হয়ে গেল, খালি আসন রইল না একটিও। গৌতম কৌতূহলভরা চোখ নিয়ে মঞ্চের সাজসজ্জা ও আলোর ঝিলিমিলি দেখছে, আর ভাবছে কখন সোনালী রঙের ঐ ভারী পর্দাটি সরে যাবে।

খেলার মাঠের বাঁশির মতো একটি আওয়াজ হল। নিমেষের মধ্যে সব শান্ত, সকলের চোখ পর্দার উপর, বাইরের আলো নিভে গেল, ধীরে ধীরে পর্দাটি সরে গেল দু-পাশে। মঞ্চের ভিতর নীলাভ আলোয় দেখা গেল একটি ছেলে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে, পরণে খাকি হাফ-প্যান্ট ও সাদা হাফ-সার্ট, পায়ে সাদা মোজা ও কালো জুতো। তার মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল, বয়স আট-নয় বছর। কোনো দিকে না তাকিয়ে সে একমনে হেঁটে আসছিল, এমন সময় বিপরীত দিক থেকে একটি ছেলে এসে তার সামনে দাঁড়াল। হাসিভরা মুখ, নীল উলের টুপি, গায়ে সাদা সোয়েটার, পরণে পশমের প্যান্ট, জুতো লম্বা দুটি সরু তক্তার ওপর আটকানো, গলায় মাফলার, দুই হাতে দুটি সরু লাঠি, তার আগায় লাটাইয়ের মতো চাকা লাগানো, পিঠে একটি ছোটো থলি বাঁধা। সে হাফ-সার্ট-পরা ছেলেটির দিকে চেয়ে মিট্‌মিট্ করে একটু হাসল, তারা দুজন প্রায় সমবয়সী।

——কি আমায় চিনতে পারলে না ? কৌতুকের হাসি হেসে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল।

——না ভাই, নিজেই পরিচয় দাও না। আমার নাম অমল, বাংলাদেশে আমার বাড়ি।



——আমার নাম টেল, বাড়ি সুইজারল্যাণ্ডে।

——ও, চিনেছি, সেখানকার ঘড়ি খুব নামকরা।

——শুধু ঘড়ি নয়, আমাদের অনেক জিনিসই তোমার ভালো লাগবে।

——তুমি কি এখন খেলতে যাচ্ছ? অমল জিজ্ঞেস করল।

——না, স্কুলে যাচ্ছি। ভাবছ অমন পোশাকে কেন? আমাদের বাড়ি সব পাহাড়ের গায়ে। নীচের উপত্যকায় আবাদীজমি, পাহাড়ের ধারে পাইন বন, তার ওপরে পাহাড়ের ঢালে বসত বাড়ি, তারও ওপরে গোরু-চরানোর ঘাসের জমি। শীতকালে এমন বরফ পড়ে যে, পাহাড়ের গা ঢেকে যায়, ওঠানামার পথ তখন চাপা পড়ে থাকে তুষারের নীচে। তখন আমরা এমনি স্কি-তে করে পাহাড়ের গা বেয়ে সরসর করে নীচে নেমে যাই।

অমল বলল— আমাদের দেশে গোরু-বাছুর চরে সমতলে, তোমাদের দেশে পাহাড়ে চরে কেন?

——তা বুঝলে না? টেল বলল—আমাদের দেশে তো সমতল ভূমি নেই। এখানে পাহাড়, ওখানে পাহাড়, তার ফাঁকে ফাঁকে ফালি জমিতে গম, আলু চাষ করা হয়। শীতের শেষে বরফ গলে গেলে কোমল সবুজ ঘাসে পাহাড়ের গা ছেয়ে যায়। তখন আমরা সবাই গোরুগুলো নিয়ে সেই ঘাসের রাজ্যে চলে যাই। তখন কি মজা। আকাশ নীল, চারি দিকে রঙিন ফুলের মেলা। সারা বসন্তকাল গোরু-বাছুর সেখানে থাকে। দুধ দুইয়ে নীচে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, অনেক দুধ।

——তোমরা খুব দুধ খাও বুঝি?

——দুধ থেকে তৈরি হয় মাখন, পনির, চকোলেট। আমরা খাই, আর বিদেশে পাঠানো হয় প্রচুর। এখন শীতকাল। গোরুগুলো বাড়িতে ফিরে এসেছে। আমাদের বাড়ির চালে পুরু হয়ে বরফ পড়েছে। আমরা এখন স্কি-তে করে ছুটোছুটি করি। ঐ যে পাহাড়ের নীচের দিকে নীল রঙের চূড়া দেখতে পাচ্ছ, ঐটিই আমাদের গ্রামের ইস্কুলের চূড়া। ঐ যে ঘণ্টা বেজে উঠল। চলি ভাই, ঠিক সময়ে ইস্কুলে হাজির হতে হবে।

এই বলেই ছেলেটি মাথা সামনের দিকে ঈষৎ হেলিয়ে বিদায় নিয়ে বরফের উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল। দুই হাতের লাঠি বরফের এখানে ওখানে ঠেকিয়ে সে নিজের দেহ সোজা রেখে চলছিল।

(২)

টেল সরে যেতেই একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। তার চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ সব অন্য রকমের। পরনে সাদা হাফ-প্যাণ্ট ও সাদা সার্ট, পায়ে কালো জুতো, মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল, হাতে একটি ছোটো রঙিন নৌকা, তাতে সাদা পাল। ছেলেটি লাজুকের মতো একটু হেসে অমলকে বলল— আমায় চিনতে পারলে না ভাই? আমার নাম আলি।

অমল বলল— মনে হচ্ছে, তুমি নদীর দেশের ছেলে।

——ঠিক বলছ, মিশর দেশে আমি বাস করি, নীলনদের তীরে একটি ছোটো গ্রামে আমাদের বাড়ি।

——আমরা নৌকা চড়তে ভালোবাসি, তোমরাও বুঝি খুব নৌকা চালাও?

তোমাদের দেশের দুটি জিনিসের কথা আমরা খুব শুনেছি— সে হল পিরামিড আর নীলনদ।

——হ্যাঁ, পিরামিড আমাদের দেশের প্রাচীনকালের কীর্তি, আর নীলনদ আমাদের চির-দিনের বন্ধু। পিরামিড এখন আর আমাদের কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু নীলনদ না থাকলে আমরা বাঁচতেই পারতাম না। আমাদের দেশের মাঝখান দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে এই নদীটি বয়ে চলেছে। তোমাদের গঙ্গানদীতে যেমন বারোমাস অনেক পরিমাণ জল থাকে, আমাদের তেমন নয়।

তোমাদের দেশে বর্ষাকালে আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখা যায়, টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে, নদীতে বান আসে। শুনতে কেমন মজা লাগে। আমাদের দেশে তেমন হয় না। তবে বছরে একবার করে বান আসে নীলনদে। কূল ছাপিয়ে জল ছুটে চলে। তখন আমাদের খুব আনন্দ। সে জল একবার বয়ে চলে গেল তো আর পাওয়া যাবে না। তাই বাঁধ দিয়ে ধরে রাখতে হয়, আর সারা বছর ধরে চলে চাষ-আবাদের কাজ।

——তোমরা কিভাবে চাষ কর, কী ফসল ফলাও, ভাই আলি?

——আমার বাবা জমি চাষ করেন, আমিও তাঁকে সাহায্য করি। তোমাদের দেশের মতো আমরাও গোরু-মোষ দিয়ে চাষ করি। ধান, গম, ভুট্টা, তুলা, নানারকম তরি-তরকারি আমরা উৎপন্ন করি। আর আমরা পাই বড়ো বড়ো খেজুর।

——তোমরা কোথায় পড়?



——আমাদের গ্রামে পাঠশালা আছে। সেখানে পড়তে শিখি, লিখতে শিখি, আর কেমন করে চাষ-আবাদ করা যায়, তাও শিখি। আমি বড়ো হয়ে চাষী হব। যদি আমাদের বাড়িতে যাও আমাদের ক্ষেত-খামার তোমাকে দেখাব। পাকা খেজুর গাছ থেকে পেড়ে খেতে দেব, নৌকা নিয়ে নীলনদে বাইচ খেলব। মাথার উপরে নীল আকাশ, দুধারে সবুজ ক্ষেত আর তার মাঝখান দিয়ে সোনালী রোদে নীলনদ ঝল্‌মল্ করে। জল না তো, যেন গলানো সোনা।

অমল বলল— বাঃ! একটা ছবি হল যেন। আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে।

——তোমার নিমন্ত্রণ রইল। আচ্ছা, এখন আসি ভাই। বলে আলি হেসে অভিবাদন করে চলে গেল।

(৩)

——কি, আলির দেশে যাবে, আমাদের দেশে যাবে না? হাসিমুখে একটি মেয়ে অমলকে জিজ্ঞাসা করল। আলি চলে যেতেই সে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল, কখন মেয়েটি এসেছে, লক্ষ্য করে নি। বয়স বছর আটেক, গায়ের রঙ গোলাপের পাপড়ির মতো, লাল চুলে নীল রেশমী ফিতে বাঁধা, পায়ে সাদা মোজা আর লাল জুতো, পরনে সবুজ ফ্রক আর তার উপর লাল পশমের সোয়েটার, কাঁধে ঝোলানো বইয়ের ব্যাগ। আকাশের মতো নীল মেয়েটির চোখের মণি। অমল একদৃষ্টে সে দিকে চেয়ে ছিল।

——আমার নাম ইনগ্রিড, নরওয়ে আমার দেশ। আমাদের দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে।

——আমাকে তোমাদের দেশের কথা একটু বল-না। নানা দেশের কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।

——পাহাড়, খামার ক্ষেত, বন, হ্রদ এ-সব নিয়ে আমাদের দেশ দেখতে ছবির মতো সুন্দর। পশ্চিম দিকে খাড়া পাহাড়ী উপকূলে ছোটো বড়ো অনেক খাঁজ। এর মধ্যে সাগরের জল নীল আয়নার মতো দেখায়।

——আমার কিন্তু খুব দেখতে ইচ্ছা করে।



পাহাড়ের ঢালে আমরা ফসল ফলাই—গম, আলু, তরি-তরকারি। আমার বাবা চাষী, তিনি আবার সাগরে মাছও ধরেন। আমাদের খামারে আছে গোরু, ছাগল, মেষ। এদের আমরা খুব যত্ন করি।

——সাগর থেকে তোমার বাবা কী মাছ ধরেন ?

——উপকূলের কাছে পাওয়া যায় হেরিং। মার্চ মাসে কড মাছ ধরতে তিনি নৌকা নিয়ে যান লোফোটেন দ্বীপের কাছে। সেখানে হাজার হাজার নৌকা জড়ো হয়। তোমাদের দেশে জেলেরা যেমন মাঝ-নদীতে ইলিস মাছ ধরে, আমাদের দেশের লোকেরাও তেমনি ধরে কড্ মাছ। হাজার হাজার, লাখ, লাখ।

——এত মাছ তোমরা কি কর ?

——বা রে! সেগুলো শুকিয়ে লবণ দিয়ে কিংবা ঠাণ্ডায় জমাট করে টিনে ভরতি করা হয়, তার পর পাঠানো হয় বিদেশে। কড্ মাছের যকৃৎ থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তাই কড্‌লিভার-অয়েল।

——হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমি একবার কড্‌লিভার অয়েল খেয়েছিলাম। কেমন একটু আঁশটে গন্ধ, কিন্তু খুব উপকারী।

——ঠিক বলেছ। আচ্ছা, তোমাকে আর-একটা জিনিস দেখাব—দুপুর রাতে সূর্য।

অমল ভাবলে ইনগ্রিড কৌতুক করে একটু বেশি বেশি বলছে। অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল— রাতে আবার সূর্য দেখা যায় নাকি ?

——হ্যাঁ, গতবছর গরমের সময় বাবা আমাদের দেশের উত্তর অংশে দুপুর রাতের সূর্য দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাত বারোটার সময় আকাশে সূর্য দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি কোনো স্বপ্নের রাজ্যে চলে গেছি। ফেরার সময় ল্যাপ্‌দের শিবিরে গিয়ে বল্‌গা হরিণ দেখেছিলাম। তাদের শিংগুলো দেখতে ডালপালার মতো, আর মখমলের মতো কোমল। আমরা হরিণদের গায়ে, শিঙে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের দেশে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ রইল। এই বলে নমস্কার করে ইনগ্রিড ছুটে চলে গেল।

(৪)

——কি ভাই, তুমি ইউরোপের একপ্রান্তে নরওয়েতে ইনগ্রিডদের দেশে যাবে, আর বাড়ির কাছে আমাদের দেশে যাবে না ? আমার নাম ইউসুফ, বাড়ি মালয়ে।

নূতন কণ্ঠস্বর শুনে অমল চেয়ে দেখে একটি ছেলে তার দিকে চেয়ে হাসছে। তার মতই শ্যামবর্ণ, পরনে নীল হাফপ্যাণ্ট, সাদা হাফসার্ট, পায়ে হাওয়াই চটি, মাথায় ছোট কালো ফেজ টুপি, হাতে তার ঘুড়ি আর লাটাই।

তোমাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে ! বলল অমল।

——তা হবেই। আমাদের সঙ্গে অনেক মিল আছে তোমাদের। আমাদের দেশ কিন্তু ভাই, মোটেই নরওয়ের মতো নয় !

অমল কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল—কেমন তোমাদের দেশ ?

——বারোমাস বৃষ্টি হয় আমাদের দেশে। কী ঘন বন, কত রকমের ফুল, কত রকমের জীব-জানোয়ার।

——বাঘ আছে ?



—হ্যাঁ, বড়ো বড়ো বাঘ, হাতি, গণ্ডার, বিরাট্ লম্বা অজগর, সে আস্ত হরিণ ধরে গিলে খেয়ে ফেলে।

জীবজন্তুর কথায় অমলের চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে ওঠে। জিজ্ঞেস করে—জানোয়ার সব তোমাদের বাড়িতে আসে ?

—না, যেখানটায় আমাদের বাড়ি, সেখানে বন খুব গভীর নয়। সেখানে আছে হরিণ, গাছে গাছে আছে বানরের দল, আছে শুয়োর, সাপ। মাটি স্যাঁতসেতে বলে আমাদের ঘরগুলি খুঁটির ওপরে উচুতে। মই দিয়ে আমরা ওঠানামা করি।

—তোমাদের ইস্কুলঘর কেমন ? কি পড়াশুনা কর ?

—আমাদের ইস্কুলঘরও খুঁটির ওপর তৈরি। আমরা পড়া ও লেখা শিখি। অঙ্ক করি, কি করে শাকসব্‌জি ভালো উৎপন্ন করা যায়, তাও শিখি। ছুটির পর রবার বনে কাজ করতে খুব ভালো লাগে।

—রবার বুঝি গাছে হয় ?

ইউসুফ হাসতে লাগল। বলল—না না, গাছে হয় না, গাছের রস থেকে তৈরি হয়। আমাদের রবার বাগান আছে। বাবা সেখানে কাজ করেন। মা এবং আমিও সাহায্য করি। গাছের গোড়ার দিকের বাকল কিছুটা কেটে সেখানে বাটি লাগিয়ে রাখা হয়। রবার গাছ থেকে দুধের মতো সাদা ঘন রস বের হয়। সেই রস জমাট করে তৈরি করা হয় রবার।

—আমাকে রবার বন দেখাতে নিয়ে যাবে ?

——হ্যাঁ, আমাদের ইস্কুলও দেখাব। ইস্কুলের মাঠে আমরা সবাই মিলে রঙিন ঘুড়ি ওড়াব। আর রাত্রিতে মায়ের কাছে রামায়ণের আর জাতকের গল্প শুনব।

——আমাদের দেশের গল্প তোমরা জান ? অমল বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

ইউসুফ হাসে আর বলে— জানি বৈ কি ?

অমল উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল— ঠিক বলছি, আমি যাবই যাব।

ওরা দুজনে একে অন্যের হাত ধরে কিছুক্ষণ নীরবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাথা ঈষৎ হেলিয়ে ডান হাত তুলে বিদায় নিয়ে দুজনে দুদিকে চলে গেল। মঞ্চের সামনেকার ভারী পর্দা নেমে এল। বাইরের আলো জ্বলে উঠল।

পুলক বলল— দেখা তো শেষ হল, চল এবার বাড়ি।

গৌতমের কানে তখনো নানাদেশের ছেলেমেয়েদের কথাগুলি বাজছিল।

সে বলল— আচ্ছা, মামা, ঐ-সব ছেলেরা যা বলল, ওদের দেশ কি ঐরকম ?

——হ্যাঁ, ওরা ঠিকই বলেছে। নানাদেশের অবস্থা অনুসারে ওদের খাবার জিনিস, পোশাক-পরিচ্ছদ আলাদা রকমের। কিন্তু অনেক বিষয়েই আমাদের সঙ্গে মিল আছে। সব দেশের ছোটোদের মন একই রকম, কেমন সরল হাসিখুশি।

গৌতম বলল— সত্যিই, তাই ওদের আমার খুব ভালো লাগল।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর অর্থ শেখো :—
মেলা ; সার্কাস ; প্রদর্শনী ; পার্ক ; স্কি ; উপত্যকা ; অভিবাদন ; পিরামিড ; জাতকের গল্প ; বল্‌গা হরিণ ; আনমনা ; উপকূল ; কীর্তি।

২। নীচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ বলো :—
কোমল ; শুকনো ; পূর্ণ ; আলো ; সমতল ; সাদা ; সোজা ; নীরবে।

৩। কোন্ দেশে—
(ক) নদীতে বছরে একবার বান আসে ? ———
(খ) ঘরগুলো কাঠের খুটির উপর তৈরি ? ———
(গ) গোরু-বাছুর পাহাড়ের উপর চরে ? ———
(ঘ) গরমকালে উত্তর অংশে দুপুর রাতে সূর্য দেখা যায় ? ———

৪। বানানের পার্থক্য লক্ষ্য করে অর্থ শেখো :—
বান ; বাণ।

৫। অমল টেলের কাছ থেকে তাদের দেশের যে পরিচয় লাভ করল, তা ছোটো করে বলো।

৬। আলি নীলনদকে তাদের চিরকালের বন্ধু বলল কেন ? তাদের দেশে কী কী ফসল ফলে ?

৭। কল্পনা করো, তুমি এখানে যে কয়টি দেশের বর্ণনা আছে তার মধ্যে একটি ঘুরে এসেছ। ঐ দেশে তুমি কী দেখেছ তার বিবরণ দিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে চিঠি লেখো।

৮। এই লেখায় কী কী রঙের কথা বলা হয়েছে ? সেই শব্দগুলি দিয়ে একটি করে বাক্য রচনা করো।

৯। 'শিশুর মেলা' এই নাম দিয়ে 'দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে' লেখাটি নাটকরূপে অভিনয় কর।

১০। নানান দেশের ছেলেমেয়েদের পোশাক পরে অভিনয়ের আয়োজন করো।
বলতে হবে — 'নমস্কার। আমার নাম ...... । আমার বাড়ি ...... দেশে।

১১। ভিন্ন ভিন্ন দেশের পুতুল জোগাড় করে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করো।

শব্দসূচী

নবপর্যায় 'কিশলয়'-এর প্রত্যেক পাঠের শেষে সেই সেই রচনায় ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত দুরূহ শব্দগুলি অনুশীলনী অংশে উপচিত হয়েছে। বর্ণানুক্রমে সেই সব শব্দ পুস্তকের পরিশিষ্টে সংকলিত হল। জ্ঞাতব্য শব্দগুলি এক জায়গায় থাকার ফলে বানান, অর্থ ও প্রয়োগের পুনরনুশীলনে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হবে। বর্ণানুক্রমিক এই শব্দসূচী অবলম্বনে শিক্ষকেরা ছাত্রদের অভিধান ব্যবহারে উৎসাহিত করতে পারবেন।

অগাধ
অঙ্গ
অঙ্গন
অতিরিক্ত
অত্যন্ত
অনুরাগী
অন্ততঃ
অন্তিমে
অন্যত্র
অন্ধকার
অপেক্ষাকৃত
অফুরান
অবিরাম
অভিবাদন
অর্থ ছাড়া
অশ্রু
অসংখ্য
অস্থানে

আগ-বাড়িয়ে
আঙিনা
আদুল গায়ে
আদেশ মানা
আনমনা
আনমনে
আপনজন
আবছা
আবরণ
আমদানি
আরবী ঘোড়া
আরাম কেদারা
আলো
আশমান
আশ্চর্য
আহত

উন্মাদ
উপকূল
উপত্যকা
উপযোগী
উপলক্ষে
উপাখ্যান
উল্লেখযোগ্য

ঊর্ধ্বশ্বাসে

এক
একত্র
একরাশ
এরোপ্লেন

কঠিন
কন্‌কনে
কভু
করুণা
কল্পতরু
কাঁচামাল
কাজল-কালো
কাণ্ডারী
কাতর
কাবু
কামনা
কালো
কীর্তি
কূলে
কোমল
কোলাহল
ক্রন্দন
ক্রমাগত
ক্লান্ত

খরতর
খালি

গগন
গঞ্জ
গরম
গাড়ায়
গুঞ্জনস্বরে
গুঞ্জরি
গুনগুন
গোরুর বাথান

ঘাটতি
ঘুচায়ে

চটপট
চমৎকার
চরণ-দাঁড়ে
চাঁদোয়া
চারি ভিত
চুকে
চৌকিদার

ছমছম

জগতে
জন্মাবধি
জর্জর
জাতকের গল্প
জীবন ধরি
জীর্ণ
জুজুবুড়ী
জোদ্দার
জোরালো
জ্যোৎস্না

ঝলসানো
ঝাঁজর

ঠাণ্ডা
ঠেলাঠেলি
ঠ্যাঁটা

ডানা
ডোবে
ডিঙি

তপ্ত
তরল
তরণী
তরী
তাপ
তামার-টাটে
তুফান

দক্ষিণ বায়
দমকা-হাওয়া
দানো-গিরগিটি
দুলকি চালে
দেশান্তরে

ধরণী
ধরে
ধার
ধারা
ধারাপাত
ধুমধাম
ধোঁয়া
ধোঁয়া-ডানা
ধোয়া

নক্‌শা-কাটা
নব
নাগরদোলা
নিঃঝুম
নীচে
নীড়
নীরবে
নৈবিদ্য

পড়ে
পরশ
পরিবার
পাটায়
পাড়া
পাড়ি
পান্থ
পার্ক
পারা
পারি
পালা
পিঠেপুলি
পিরামিড
পুঞ্জিত
পূর্ণ
পেতে
প্রকাণ্ড
প্রচুর
প্রদর্শনী
প্রাচীন
প্রান্তর
প্লাবন

ফর্দ
ফাটল-ধরা
ফিসফিসিয়ে
ফুকারে
ফোঁড়

বজ্রওয়ালা
বন-বাদাড়
বন্য
বর্ণে বর্ণে
বরষণ
বরিষণে
বলগা হরিণ
বাদল
বাধা
বায়োস্‌কোপ
বারিধারা
বামন
বিকশিত
বিচ্ছিরি
বিন্দু বিন্দু
বিরক্ত
বিরাট্
বিলাপ
বুড়ীর-সুতো
বেচারি
বেঁটে
বেণুবন
বেদনা
বেয়ে
ব্যস্ত

ভানে
ভাব
ভাসন্ত
ভীষণ রবে

মতি
মওতা
মনোহর
মন্থর
মর্মরে
মরে
মহর্ষি
মাউথ-অরগান
মাগিয়া
মাঝখান
মাতন
মাত্রা
মানা করা
মাল্লা
মুদতে পারি
মেলা

যেতে

রক্তপাত
রব
রবি
রুক্ষ
রেখা

লম্বা
লাগি
লোক

শরণ
শিরদাঁড়া
শুকনো
শুভ
শোঁকে
শ্রাবণ-মেঘ

সংখ্যা
সংগ্রহ
সংস্পর্শ
সঙ্গীহারা
সন্তোষ
সফল
সমতল
সমবয়সী
সমুদ্র
সরোবর
সাড়া
সাদা
সামনে বাড়ে
সারা
সার্কাস
সুড়সুড়ি
সোজা
সোরগোল
সৃষ্টি
স্কি
স্তব্ধ
স্নান
স্পন্দিত
স্বচ্ছ

হাঁকাহাঁকি
হাটুরে
হাবা
হালকা
হিয়ের
হৃদয়ে
হেন

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

सत्यमेव जयते

653953

/75/KS I